বিলাতের পত্র।

ষ্টীমার ম্যায়রা।

২৫ শে ডিসেম্বর।—১৮৮১ সাল।

ভাই! বন্ধুরা ত আমাকে ২১এ ডিসেম্বর ভোর বেলা কয়লাঘাট হইতে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া—ভাসাইয়া দিয়া—চলিয়া গেলেন। যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে দেখা যায়, দেখিলাম। তাঁহারা অদর্শন হইলে, আমি সব শূন্য দেখিলাম। কোথায় যাই, কি করি? ক্যাবিনে সর্দ্দি গর্ম্মি হইতে লাগিল। মনের কষ্টে শীত কোথায় পলাইল। প্রাতঃকালে জাহাজ ছাড়িল,—ভাসিয়া চলিলাম,—বেঙ্ক, হাইকোর্ট, প্রিন্সেপস্ ঘাট, দুর্গ, নবাবের বাড়ী—ক্রমে সব অদর্শন হইল। বেলা ছয়টা হইতে সাহেব যাত্রীরা চা খাইতে আরম্ভ করিল। আমাকে কেহ কোন কথা সে পর্য্যন্ত বলে নাই; মনের কষ্টেই হউক, আর যে কার-

সেই হউক, আমার দারুণ পিপাসা বোধ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাকে বলিলাম (বেলা তখন ৭॥টা) চা দাও। এখন থেকে শিক্ষা আরম্ভ হইল। সে বলিল, ৭॥ টার পর চা পাওয়া যায় না; ৬ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত সাহেবেরা চা খাইয়া থাকে। তার পর ৮ টার সময় একটা ঘণ্টা বাজিল। সাহেব খানসামা আমাকে শিখাইয়া দিল এটা (Warning bell) জানান্ ঘণ্টা। ৮॥ টার সময় আবার ঘণ্টা দিলে বালভোগ করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় ঘণ্টা বাজিল; আমি যেন কলে খাবার ঘরে ঢুকিলাম। খাবার সময় সসাজে যাওয়া আবশ্যক—কেবল টুপিটা ঘরে রাখিয়া প্রবেশ করিতে হয়। আমি ইহা জানিতাম না,—সকল সাহেবের দেখিয়া শিখিলাম। খাবার পূর্ব্বে ও খাবার সময় সকলের কাছে এক একটা কাগজ ফেরে; কি কি খাবার প্রস্তুত হইয়াছে, সেই কাগজে লেখা থাকে। যাহার যা ইচ্ছা, বাছিয়া লও। দুই প্রহর আধ ঘণ্টার সময় টিফিনের ঘণ্টা হইল। টিফিনের সময় লেখা কাগজ ফেরে

না; কেন তাহা ঈশ্বর জানেন, আর সাহেবরাই জানেন। তার পর সন্ধ্যাকালে ৫॥ টার সময় জানান্ ঘণ্টা হইয়া ৬ টার সময় প্রধান আহারের (Dinner) ঘণ্টা হইল। সাহেবদের সহিত সসাজে খাবার ঘরে (Saloon) ঢুকিলাম—বাদ টুপী। এ সময়ও লেখা কাগজ ফেরে—যার যা ইচ্ছা খাও। এই ত খাবার বিষয়। রোজ এই রকম। নানা রকমের পিঠে দেয়, কিন্তু প্রায় সব অভক্ষ্য।

বুধবার দিন কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িয়া কুল্পী নামক একটা স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল। ভাটা হইয়াছে, জল অতি কম। রাত্রির জোয়ারে জাহাজ ছাড়িবার হুকুম নাই, কাজেকাজেই বৃহস্পতি বার দিন বেলা ৮॥ পর্য্যন্ত জোয়ারের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। ৯ টার সময় জাহাজ চলিল—সেই যে চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। অদ্য শুনিলাম, কলম্বো গিয়া রাত্রে নঙ্গর করিয়া থাকিবে। ভাই! কেবল সমুদ্র—কেবল সমুদ্র, আর কিছুই নাই, বড় বিরক্ত ধরিয়াছে। সমুদ্রে জীবের চিহ্ন মাত্র নাই, মধ্যে মধ্যে কেবল উড়নশীল মৎস্যের (Flying fish)

ঝাঁক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খানিক দূর উড়িয়াই আবার জলে পড়ে। জলের অল্প উপরেই উড়ে। পাখীর মত আকাশে উড়ে না। দূর হইতে দেখিতে টেঙ্গরা মাছের মত। এতদ্ভিন্ন কোন জীব এখানে দেখিলাম না।

একটা কথা ভুলিলাম। বৃহস্পতিবার সকাল বেলা যখন কুল্পী নামক স্থানে জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, তখন নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কতকগুলি লোক নৌকা করিয়া দুধ, ডিম্ব, টুপী ও এক রকম ধামা বিক্রয় করিতে জাহাজে আসে। ধামাগুলি অতি সুন্দর। ফিরিয়া যাইবার সময় হইলে ২।৪ টি কিনিতাম। দেখিবার জন্য এক জনের কাছে গেলাম। দাম জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল—"সাহেব, তিন আনা।" সাহেব বলিয়া সম্বোধনের এই আরম্ভ—এ কলঙ্ক কি আর ঘুচিবে?

খাবার কথা বলিয়াছি, স্নানের কথা বলি নাই। ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে স্নান করিব—বলিতে হইবে, নচেৎ সেদিন স্নান হইবে না। ইহারই মধ্যে আমি দুদিন স্নান করিয়াছি। সাহেবদের

মত স্নান—বুঝিলে ত? সমুদ্রের জলে স্নান করিয়া শেষে মিঠা জলে গা পুনর্ব্বার ধুইতে হয়।

তার পর পোষাকের কথা। আমার ঘরে আর কেহ থাকে নাই, এজন্য শয়নের সময় কাপড় পরিয়া শুই। প্রথম দিন শীত ছিল; বিলাতী কম্বল গায়ে দিতে হইয়াছিল। যত দক্ষিণে যাইতেছি, তত শীত কম। দিনে বেশ গ্রীষ্ম বোধ হয়। রাত্রে গায়ে কাপড় সহ্য হয় না। একটা বড় ভুল হইয়াছে। গোটাকত সাদা জামা পেণ্টুলেন ও সাদা কোট্ বড় আবশ্যক; কিন্তু না জানার দরুন আনা হয় নাই। বালভোগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহেবেরা ঢিলে পাজামা, সাদা কোট্, চটী জুতা পরিয়া থাকে; কিন্তু আমার চটী জুতা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

লঙ্কা দ্বীপ, কলম্বো।

২৭শে ডিসেম্বর।

কাল রাত্রে দশটার সময় কলম্বোতে আসিয়া জাহাজ নঙ্গর করিয়াছে। আমি প্রাতে উঠিয়া

বন্দরটী দেখিলাম—কত জাহাজ, বোট, নৌকা, সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছে;তীরে কতকত ঘর রহিয়াছে। জাহাজ থেকে দেখিতে অতি সুন্দর,পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শুনিতেছি বৈকাল পর্য্যন্ত এখানে থাকিতে হইবে। কাল সমস্ত দিন আমাদের ডান ধারে লঙ্কা-দ্বীপ দেখিয়াছি ; একজন সাহেবের দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিয়াছি—দ্বীপে কেবল পাহাড় আর গাছ ; কি গাছ জান ?—কেবল নারিকেল গাছ। বৈকালে অল্প ঝড় দেয়—সমুদ্রটী দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল। কল্য লোকালয়ে আসিতেছি—এমন বোধ হইয়াছিল—সমুদ্র জেলে-ডিঙ্গিতে পূর্ণ—শত শত পাখীও দেখা গেল। পয়েণ্ট-গল নামক স্থানটী পাস করিয়া আসিলাম,—অতি মনোরম ; একটী গির্জ্জা অতি সুন্দর। আজ আমরা যেখানে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছি, সেখান হইতে ডাঙ্গা অতি নিকট, এখান হইতে ঢিল ছুড়িলে ডাঙ্গায় যায়।

সুয়েজ বন্দর।

৯ই জানুয়ারি।—১৮৮২।

পূর্ব্ব পত্রে কলম্বো পৌঁছান পর্য্যন্ত খবর দিয়াছি। যে রাত্রে কলম্বো পৌঁছি, তার পর দিন অর্থাৎ ২৭সে ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে প্রায় সকলেই জাহাজ থেকে নামিয়া কূলে গিয়াছিলেন। আমি যাই নাই, মন গেল না; একা যাইতে ভাল লাগিল না। ভাগ্যে যাই নাই, বৈকালে জাহাজে ফিরে আসিবার সময় যাঁহারা গিয়াছিলেন, তুফানে তাঁহাদের নাকালের একশেষ; সকলেই নাকানি চোবানি খেলেন; আমি জাহাজে বসিয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। তাঁহারা যে সকল ছোট ছোট নৌকা করে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন, দেখিতে এক নূতন রকম; অনেকটা আমাদের দেশের নৌকার মত। উড়িষ্যায় কাঠুয়া বলে এক রকম ডোঙ্গা আছে, প্রায় সেই রকম। তাহাতে দুইজন মাত্র ভদ্র লোক অথবা তিন জন মজুর বসিবার (পাস) অনুমতিপত্র আছে। এ ছাড়া দুই তিন খানা কাঠ একত্র

করিয়া এক রকম ডোঙ্গা করিয়াছে দেখিলাম, সে বড় মজার। আমাদের দেশে এ রকম কখন দেখি নাই। শ্রীক্ষেত্রে নুলিয়ারা এই রকম ডোঙ্গা চড়িয়া সমুদ্রে মাছ ধরে, ও যাতায়াত করে। এতে আবার সময় মতে পাল দেওয়া হয়, ডোঙ্গা তখন তীরের মত তীব্র বেগে দৌড়ে।

পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, লঙ্কাতে ঝিনুকের (tortoise shell) অতি সুন্দর সুন্দর জিনিষ পাওয়া যায়। যথার্থই বটে। অনেকগুলি সেদেশী লোক জাহাজের উপর উঠিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। তারা সকলেই একটু একটু ইংরাজী কহিতে পারে; মাঝি, মাল্লা, কুলি পর্য্যন্ত ইংরাজী কয় ও এক রকম বোঝে। তাহারা যে সকল জিনিস বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল, তাহা আমাদের কোন কাজেই আসে না, সব ইংরেজ-পছন্দ ও তাহাদেরই দরকারী; নামও সব ইংরেজি। যত পারি আমি বাঙ্গালা নাম করে দিলাম—"চুরটের বাক্স", "কার্ড-বাক্স" "গলার হার" "বালা", বোতাম, ইত্যাদি নানা রকম জিনিষ। এ ছাড়া ছড়ি, কাঠের বাক্স, কাঠের ও হাতীর দাঁতের

ছোট ছোট হাতা, তীর ধনুকও বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল; তারা দেখিতে তেলেঙ্গাদের মত। জোলাদের মত ডূরে কাপড় পরা, গায়ে একটা জামা, মাথা আঁচড়ান ও তার উপরে একটা বাঁকা চিরুণী। কুলিদের মাথায় এক একটা ডুরে চাদর বাঁধ। ভাষা শুনিতে তেলিগু ভাষার মত।

পূর্ব্বেই বলেছি কলম্বো বন্দরটি অতি সুন্দর এবং শুনিলাম সম্পূর্ণরূপে তৈয়ার হইলে গল (Galle) বন্দর ছেড়ে দিয়ে এইটিই প্রধান বন্দর হবে। আকার ঠিক দ্বিতীয়ার কি তৃতীয়ার চাঁদের মত; কোর্ দিকটা সমুদ্রের দিকে। বন্দরে ঢুকিতে ডান ভাগটা সাদা পাথরে গাঁথা, শুনিলাম, এখন যা গাঁথা হয়েছে,তাহা ছাড়া আরও ১ মাইল ১॥ মাইল গাঁথা হইবে। আমরা দেখিলাম কলেরগাড়ি করিয়া পাথর আনা হইতেছে; গাঁথাও চলিতেছে। গাঁথা ভাগটির ইংরেজী নাম "Break water" অর্থাৎ তরঙ্গের তোড় ভাঙ্গা ইহার উদ্দেশ্য। বন্দরের সম্মুখভাগে অনেকগুলি দুই তিন তালা কুঠী, তন্মধ্যে যেটি আমার সব চেয়ে ভাল বোধ হইল, সেটি কি জিজ্ঞাসা করাতে, অনেকে বলিল,

ওটি একটী হোটেল। বন্দরের বামভাগে অনেকগুলি খোলার ঘর দেখা গেল। বলা আবশ্যক, দুইটি গির্জ্জা দেখিলাম, একটি কাথলিক (Catholic), এবং অপরটি প্রোটেষ্টেণ্ট (Protestant); লঙ্কার পূর্ব্বভাগ যেখানে গল প্রভৃতি বন্দর আছে—সেভাগটা পাহাড়ে আবৃত; কিন্তু কলম্বোর দিকেতে কৈ পাহাড় দেখা গেল না।

সোমবার ২৬ শে ডিসেম্বর রাত্রি ১০ টার সময় হইতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত জাহাজ কলম্বোতে থাকে। ঠিক্ ৬ টার পর জাহাজ ছাড়ে, ছাড়িবার সময় যে তুফান তা তোমাকে আর কি বলিব; ভয়ানক তুফান, আমি আস্তে আস্তে ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া নিজের ঘরে এসে ঘুমাইলাম এই সময়ে আমার গাটা অল্প অল্প বোমি বোমি করিয়াছিল, এতদিন করে নাই।

আমাদের জাহাজের গতির কথা বলে রাখি; কোন দিন ২৮০, কোন দিন ২৭০, কোন দিন, ২৬০, বা ২৫৫ মাইল—এই হিসাবে যায়। গড়ে ঘণ্টায় ১০৷৷৹ মাইল যায় ধরা যেতে পারে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় কলম্বো ছাড়িয়া অবধি

২ রা জানুয়ারি সোমবার বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত সমুদ্র ভিন্ন আর দেখিবার কিছুই ছিল না; ইহাতে যে কি কষ্ট তা তোমরা বুঝিতে পারিবে না, যারা একবার ভুগিয়াছে, তাহাদের মনে দগ্ দগ্ করিতেছে। তবে সমুদ্র ছাড়া মধ্যে মধ্যে এক আধখানি জাহাজ দেখা দিয়াছিল; এবং মধ্যে দুদিন অত্যন্ত তুফান, মেঘ ও বৃষ্টি হয়। আমার এক দিন মাত্র শরীরটে খারাপ হয়েছিল, তার পর বেশ আছি।

২রা জানুয়ারি ৫টার পর সকট্রা দ্বীপ আমাদের ডানধারে দেখা গেল; দেখা আবার কেমন,—কেবল আব্ছাওয়া মাত্র। তার পর দিন (৩রা মঙ্গলবার) বাঁদিকে গার্ডাফুই অন্তরীপ প্রাতঃকালেই দেখা গেল। সমস্ত দিন তার পর সমুদ্র আর সমুদ্র—যত ইচ্ছা দেখ। এই দিন দুটি ধর্ম্মযাজক সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইয়া মনটা অনেক ভাল হইয়াছে; তাঁরা বড় ভদ্র, লঙ্কায় তাঁরা থাকেন, শরীর অসুস্থ বশত দেশে যাইতেছেন। তাঁরা মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে সেই অবধি কথাবার্ত্তা কন। অপরাপর সাহেবের মধ্যে অনেকগুলি চা-

কফি ইত্যাদি চাষী (Planter) সাহেব আছে, তাহাদিগকে দেখিয়া সাহেবদের চরিত্র বিচার করিতে হইলে ত সর্ব্বনাশ। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, তারা সাহেব চরিত্রের আদর্শ নহে। ৪ঠা বুধবার বেলা দুই প্রহর থেকে এডেন নগর দেখা যাইতে লাগিল, শুনিলাম রাত্রি ১২টার সময় আমাদের জাহাজ লোহিত সমুদ্রে ঢুকিবে, কিন্তু তত রাত্র পর্য্যন্ত কে জাগিয়া থাকিবে?

৫ই বৃহস্পতিবার থেকে আজ ৯ই সোমবার পর্য্যন্ত লোহিত সমুদ্রে। আজ সুয়েজে, কাল সকালে খালে প্রবেশ করিব। কয়েকদিন প্রায়ই পাহাড় দেখা গিয়াছিল; এ সকল পাহাড় কি জান?—দ্বীপ;—লোহিত সমুদ্রে দ্বীপে পূর্ণ। এই সমস্ত দ্বীপ আগ্নেয়। পাহাড়ের আকার দেখিলেই জানা যায় আগ্নেয়। কেতাবে যে আগ্নেয় পাহাড়ের কথা পড়া গিয়াছে, এখন চক্ষে তাহা দেখা যাইতেছে। আকার যেমন হইয়া থাকে,—নৈবিদ্যের মত; মধ্যে মধ্যে নৈবিদ্যের চূড়া থেকে পাহাড়ের অন্য অংশের রঙের অপেক্ষা, ভিন্ন রঙের ডোরা দেখা গেল; যেন পাহাড় গলে গড়িয়ে পড়েছে।

এই সকল পাহাড় গাছ শূন্য বোধ হইল। আমরা দূর হইতে দেখিলাম,—তৃণগাছটি আছে বোধ হইল না। আমরা আছি কোথায়? লোহিত সমুদ্রে। কেন লোহিত সমুদ্র বলে তা'ত বলিতে পারি না, জল ত অন্য জায়গারও যেমন এখানকারও তেমন, তবে এক রকম রাঙ্গা চেলা চেলা বা চাপ্ চাপ্ কি ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছি; (পূর্ব্বে তা দেখি নাই)। এক রকম সামুদ্রিক উদ্ভিদ বলিয়া বোধ হইল; জাহাজে একজন ডাক্তার আছেন, ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গুলা কি? তিনি দেখিলাম আমার চেয়েও পণ্ডিত, তিনি গোলে হরিবোল দিয়ে সারিলেন। যাহোক, এই হইতে যদি নাম হইয়া থাকে,—তাহা নইলে আর-ত কিছু দেখা গেল না। আবার ফিরে পাহাড়ের কথা। রবিবার দিন (৮ই) ডিডেলস্ (Dædalus) নামে প্রায় জলে ডোবা একটা পাহাড় (Reef) দেখা গিয়াছিল, সেটা জাহাজের পক্ষে বড় ভয়ানক, সেই জন্য তার উপর লোহার এক প্রকাণ্ড ৭০ ফিট উঁচু বাতিঘর (Light house) করে দেওয়া হইয়াছে। সেখানে আলোক দিবার জন্য তিনটী

লোক থাকে ; সমুদ্রবক্ষে, আকাশপথে তিনজনে "একলা" কি করে থাকে কে জানে ?

আজ সোমবার (৯ই) সকাল থেকে দেখিবার বড় বাহার। দুধারেই কিনারা—তিন চার মাই-লের মধ্যে ; কিন্তু দেখিতে আরও কাছে। এক-দিকে আরব্য দেশ, অপর (বাঁ) দিকে মিশর দেশ; ডানদিকেও পাহাড়,বাঁদিকেও পাহাড় ; কিন্তু অন্য দিনের অপেক্ষা এসকল পাহাড়ের একটু ভিন্নতা আছে। অন্য অন্য দিনের পাহাড় একেবারে জল থেকে খাড়া ভাবে উঠিয়াছিল, আজ তা নয়। আজ প্রথমে পাহাড়, তার পর সমুদ্রের দিকে বালি। বালির চটান ক্রমে ঢালু হয়ে জলের সঙ্গে মিশেছে। আজ দুই তিনটি বাতিঘর মিশর দেশের দিকে দেখা গেল, কিন্তু কাল যা দেখিয়া-ছিলাম, তাহার সঙ্গে তুলনায় অতি সামান্য। আজ অনেক জাহাজ দেখা যাইতেছে, কেহবা যাই-তেছে—কেহবা আসিতেছে। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, পরশ্ব (৭ই) সন্ধ্যার সময় আমাদের খুব কাছ দিয়ে (Adjutant) নামে একখানা জাহাজ কলিকাতার দিকে গেল, সে জাহাজ বাঁশি বাজা-

ইল, আমাদের জাহাজও বাঁশি বাজিয়ে উত্তরদিল ; এটা লিখিবার বিশেষ কারণ শুন ; সেই সময়ে আমার মনে হইল, যদি আমাদের দেশের কোন লোকও জাহাজে থাকে, তার আজ কত আমোদ।

গত কল্য হইতে আর আমরা ট্রপিকের ভিতরে নাই, তার বাহিরে এসেছি, আজ আমরা 32. Lat. N.

সায়েদ বন্দর।

১২ ই জানুয়ারি।—১৮৮২

সুয়েজে পৌঁছিয়া তোমাকে পত্র লিখিয়াছি। সন্ধ্যার পর পৌঁছি। সে দিন কিছু দেখিতে পাই নাই। তার পর ১০ ই সকাল বেলা সব দেখা গেল। এখানকার জলটা তেমন ঘোর নয়, কেমন সবুজে সবুজে। চেলা মাছের মত মাছ খেলিয়ে বেড়াইতেছে ও চীলে তাহাদিগকে ধরিতেছে। বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিয়া এখানে থাকিতে হইয়াছিল, কারণ অনেক হাঙ্গাম। প্রথমে এখন Quarantine অর্থাৎ সুয়েজ, ইসমেলিয়া প্রভৃতি নগরে বড় ওলাউঠার

ধূম; এজন্য কোন যাত্রীকে অথবা জাহাজের কোন কর্ম্মচারীকে জাহাজ থেকে নামিতে দেওয়া হয় না; কলম্বোতে যেমন সকলে নামিয়া কিনা-রায় গিয়াছিল, যদি "কোয়ারানটীন" না থাকিত, এখানেও সেই রকম পারিত। সকালে একজন সাহেব আসিয়া কাপ্তেনের নিকট তাঁহার নাম, কয়জন যাত্রী ও কয়জন কর্ম্মচারী ইত্যাদি সমস্ত লিখিয়া লইল; তার পর একজন স্বাস্থ্য-পরিদর্শক আসিয়া বলিল আমি সব কর্ম্মচারী ও যাত্রী দেখিব। আমরা তখন বালভোগে নিযুক্ত; ভোগ ছেড়ে আসিলাম, পরিদর্শক মহাশয় একবার চক্ষুপাত করিলেন, আর হয়ে গেল। তিনি তখনই চলে গেলেন। তার পর একটী লোক এসে ডাকের চিঠি ও খবরের কাগজ দিয়ে গেল ও নিয়ে গেল। যাকে যাকে আমার চিঠি লেখার দরকার আমিও লিখিয়া দিলাম। চিঠি পাঠাইতে হইলে পূর্ব্বে লিখে যে চিফ-ষ্টুয়ার্ড (Chief steward) তার জেম্মা করিয়া দিতে হয়, সে নিজে ডাকমাশুল দিয়ে দেয়, পরে যাত্রীদের নিকট হিসাব করিয়া লয়। চিফষ্টুয়ার্ডকে বাঙ্গালায় "গিন্নী" বলা যাইতে

পারে, কারণ ইহাঁর কাজ সব গিন্নীর মতন, খাবার জিনিস তিন বেলা ভাঁড়ার থেকে বাহির করিয়া দেওয়া, কি কি রান্না হবে বন্দোবস্ত করা, সবই গিন্নীর কাজ; তবে ইনি মেয়েমানুষ না হয়ে পুরুষ। মেয়েদের জন্য একজন মেয়েমানুষও আছে; তাঁর কাজ ছেলেপিলে দেখা, মেয়েরা কেকেমন আছেন, তত্ত্ব লওয়া। আমাদের খাবার জল বোধ হয় ছিল না, একখানা নৌকা এসে খাবার জল দিয়ে গেল। আগে যে সাহেবদের গমনাগমনের কথা লিখিয়াছি তাহা Steam Launch অর্থাৎ ছোট কলের বোট দ্বারা হইতেছিল। ১০ টার পর একজন Pilot (মাজী) এসে বলিল, এইবার খালে কোন জাহাজ আসিতেছে না, তোমরা চল। আমরা তখনই নঙ্গর তুলে চলিলাম; সেই মাজী ছোট একখানি কলের জাহাজে করে আমাদের সুমুখে সুমুখে পথ দেখিয়ে চলিল। নদীতে বা কাটী খালে কাপ্তেন কেহই নন, মাজী পথ দেখাইয়া চলেন। ১০ টার সময় ত আমরা কাটীখালে ঢুকিলাম, আমাদের বাম ধারে সুয়েজ নগর দেখা যাইতে লাগিল। দূরে থেকে দিব্য দেখিতে;

অনেক কোটা ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার জ্ঞান ছিল সুয়েজের কাটিখাল কতই না বড় হবে, দেখে সে ভ্রম ঘুচিল। যদি কখন উড়িষ্যার খাল দেখে থাক, তবে অনায়াসে এই বলিলেই বুঝিতে পারিবে যে, চওড়া প্রায় সেই রকম, যদি একটুকু বেশী হয়; স্থানে স্থানে বেশী প্রশস্ত দুধারে মাটীর বাঁধ না হয়ে বালীর বাঁধ, কোথাও বাঁধ খুব উঁচু কোথাও নীচু; একটী কথা বলিলেই খালের প্রশস্তের বিষয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন;—খালে একখানা বড় জাহাজ কেবল যেতে পারে। তবে যদি বল একখানা জাহাজ আসিতেছে, একখানা যাইতেছে, তাহাদের কি হয়? মধ্যে মধ্যে ষ্টেশন বা আড্ডা আছে ও টেলিগ্রাফ আছে, জাহাজ যাইবার বা আসিবার সময় এক আড্ডা থেকে আর এক আড্ডায় তারে খবর দেওয়া হয়; এক-দিক থেকে একখানা জাহাজ ছাড়িলে, অপর দিক্ থেকে আর জাহাজ ছাড়া হয় না, সেখানা সেই-খানে বাঁধা থাকে; আড্ডার কাছে এই জন্য খালটা একটু চওড়া বেশী। খাল কাটিবার সময় বোধ হয় সুবিধার জন্য মধ্যে মধে হ্রদের সঙ্গে

খাল মিশান হইয়াছে ; একটী হ্রদ—যেটীতে খাল প্রথমে এসে মিলেছে, সেটি প্রকাণ্ড লম্বা,—প্রায় ১০।১২ মাইল হইবে। এই হ্রদের এপারে এবং ও পারে এক একটা বাতীঘর আছে। এই সব হ্রদ ছাড়া খালের শেষ ভাগটির বামধারে বরাবর একটা হ্রদ দেখা গেল, ডান ধারেও সোঁতা এবং নাবাল জমি দেখিতে পাওয়া গেল ; বোধ হয় যেন হ্রদ ছিল, শুকাইয়া গিয়াছে অথবা ছেঁচে ফেলা হইয়াছে। আমাদের বামধারে দেখিলাম পাইপ (নল) রহিয়াছে ; একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—উহা জলের নল, সায়েদ বন্দর হইতে ইশমেলিয়াতে খাবার জল ইহা দ্বারা যায়। আমরা মৃদুমন্দগতিতে হেলিতে দুলিতে আজ ১২ ই দুই প্রহরের সময় বন্দর-সায়েদে আসিয়া পৌঁছিলাম ; সুয়েজ থেকে এ স্থান ৮৭ মাইল মাত্র। ভাই ! সুয়েজখাল কি তাহা তুমি অবশ্যই জান। লম্বা ৮৭ মাইলের অধিক নহে বটে, প্রশস্ত ও যং সামান্য, কিন্তু এই খালটী ইংরেজের মরণজীবনের কাঠি। ফরাসী মোঁসে লেসেপ্‌স্‌ বহুবুদ্ধি খরচ করিয়া এই খাল কাটেন—

আগে তিন মাসের কম বিলাত যাওয়া হইত না, এই খাল থাকাতে এখন ২১।২২ দিন লাগে।

সাইরেনসেষ্টার।

৯ই ফেব্রুয়ারি।

১৪ ই জানুয়ারি শুক্রবার বেলা প্রায় ২ টার সময় সায়েদ বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ে। রাত্রে ও তার পরদিন ভয়ানক তুফান; অনেকবার কালাপানি পার হয়েছি, এমন তুফান কখন দেখি নাই। কাবিন থেকে কার সাধ্য বার হয়; জাহাজ এত দুলিতে লাগিল, যে এক একবার বিছানা থেকে পড়ে যাবার মত হতে লাগিলাম। জাহাজের উপর দিয়া ঢেউ যেতে লাগিল, সেই জল আবার আমাদের ঘরে ঢুকিতে লাগিল। ইহার উপর আবার বৃষ্টি ও ভয়ানক শীত। এ পর্য্যন্ত আমার বিশেষ কোনও অসুখ করে নাই, কিন্তু আজ গা বমি বমি করিতে লাগিল, একটু যেন নির্জীব হইলাম। শুধু আমার নয়, দুএক জন ছাড়া সকলেরই অসুখ হইয়াছিল, তবে কাহারও কম, কাহারও

বেশী। ভাই! তুফানের কথা আর কি বলিব, এমনি তুফান যে জাহাজের দু এক জায়গা ভেঙ্গে গিয়াছিল।

রবিবার সকাল থেকে তুফান কমে; ৩৬ ঘণ্টার পর আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম, কিন্তু ভয়ানক শীত, কোন মতে বাহিরে থাকিতে পারিলাম না। শীত দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল, মনে হইল, সবে এই ভূমধ্য সাগরে—এখনও ঢের বাকি, যদি এই হারে শীত বাড়ে তাহা হইলে ইংলণ্ড পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি নিশ্চয় জমিয়া যাইব। কিন্তু পরে দেখিলাম, সেটা কেবল আশঙ্কা মাত্র। বলা বাহুল্য তুফানের ৩৬ ঘণ্টা কেহ আহার করিতে পারে নাই, তাহাতে অবশ্য জাহাজওয়ালাদের লাভ।

১৭ ই রাত্রে মণ্টাদ্বীপের কাছ দিয়া যাই। রাত্রি বলিয়া কিছুই দেখিতে পাই নাই। ১৮ ই সকাল থেকে বামদিকে আফ্রিকার কূল দেখা যাইতে লাগিল। টিউনিস, পেণ্টলিয়ারা আলজিরিয়া প্রভৃতি কত কত নগর, দেশ দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম; এই সব দেখিয়া

কার্থেজের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি, হানিবলের বাহুবল মনে হইল, কত কথা মনে পড়িল ; কালের কি ভয়ানক গতি, ধ্বংসাবশিষ্ট কার্থেজের আজ কিছুই নাই, জঙ্গলময় ; মনে হইল যেন নির্জীব, বৃদ্ধ হানিবল যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া সমুদ্র কূলে ঐ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন,—একটী চক্ষু অন্ধ,আর একটী চক্ষু দিয়া সারাদিন জল পড়িতেছে ! ভাই ! কার্থেজ ও হানিবলের দশা দেখিয়া, জন্মভূমির কথা মনে হইল। ভাই ! এ সময়ে কি তুমি চোখের জল রাখিতে পারিতে ?

২০ শে আফ্রিকার কূল হঠাৎ অদর্শন হইল। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, আমাদের ডান ধারে স্পেনদেশের পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে। শীতকালে পাহাড়ের উপর বরফ পড়িয়াছে, এবং তার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া কি এক অপূর্ব্ব বাহার হইয়াছে। যে জিবরল্টার দেখিবার জন্য আমরা এত আশা করিয়াছিলাম, বেলা ৪টার সময় তাহা দেখা গেল। সেখানে সমুদ্র খুব কম চওড়া, কেবল ১২ মাইল মাত্র,—একদিকে জিবরল্টার, অপর দিকে সিউটা (Ceuta)। আমরা গ্লাস

দিয়া জিবরল্টার-দুর্গ ও সিউটা নগর দেখিলাম। জিবরল্টারের দিকে দেখা গেল, পাহাড়ের ঢালে সব চষা জমী রহিয়াছে,সে সব জমী একসা নহে—ঢেউ কাটা, ঢেউ কাটা। এই সব জমীর মাঝে মাঝে এক একটী সুন্দর সাদা সাদা বাড়ী দেখা যাইতে লাগিল। এখানে একটী বাতিঘর আছে। এই রকম জায়গা দিয়া যাইবার ও আসিবার সময় সংবাদ দিয়া যাইতে হয়। ধ্বজা দেখাইয়া খবরাখবর চলে। আমাদের জাহাজে ধ্বজা তুলে দেওয়া হইল; তাহা দেখিয়া জিবরল্টার হইতেও ধ্বজা উঠিল। যে পর্য্যন্ত জিবরল্টারের লোক ধ্বজা না তুলে, সে পর্য্যন্ত জাহাজের ধ্বজা তুলে রাখিতে হয়। তার পর ধ্বজা নাবাও। জিবরল্টারের কাছে ঢের জাহাজ দেখা গেল, এই খান থেকে জাহাজের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; ভারত-সমুদ্র, আরব্য-সমুদ্রে, লোহিতসমুদ্রে কদাচিৎ দু একখানি জাহাজ দেখা যাইত,—এখন বুঝিলাম বাণিজ্যপ্রধান দেশে আসা যাইতেছে। জাহাজগুলিকে সমুদ্রের উপরিস্থ চলৎশক্তি বিশিষ্ট বাড়ী ঘর মনে হইতে লাগিল।

২২শে জানুয়ারি সেণ্ট-ভিনসেণ্ট অন্তরীপ ছাড়াইলাম; আর কূল দেখা গেল না। আমরা আটলাণ্টিক মহাসাগরের অনন্ত জলরাশি দেখিতে লাগিলাম। সোমবার রাত্রি দশটার সময় স্পেনের উত্তর সীমা ফিনিষ্টীয়ার অন্তরীপের কাছ দিয়া জাহাজ যায়। ২৪শে জাহাজ খাবার রাক্ষস বীস্কে উপসাগরে উপনীত হইলাম; এখানে প্রায়ই ভয়ঙ্কর তুফান হয়; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটে নাই; পূর্ব্বে সমুদ্র অতি ঠাণ্ডা ছিল,—যেন পুকুরের উপর দিয়া জাহাজ যাইতেছে, বোধ হইয়াছিল,—বীস্কে সাগরে আসিয়া একটু তরঙ্গ বাড়িয়াছিল মাত্র। ২৫শে ইংলিশ-চ্যানালে ঢোকা গেল; শীত বৃদ্ধি হইল, কিন্তু আমি যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলাম ততটা নহে। এইবার রৌদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিল; দিন রাত প্রায় সমান, কুয়াশায় সব অন্ধকার, ২০ হাত অন্তরের দ্রব্য দেখা যায় না। এই অন্ধকার দিয়া কাণার মত হাতাড়ে হাতাড়ে জাহাজ ২৬শে একেবারে ইংলণ্ডের কূলে এসে উপস্থিত। যে ইংলণ্ডের জন্য মন এত দিন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তাহা আজ

দেখা গেল ; যে খড়ি মাটীর কথা কেতাবে পড়িতাম, তাহা সেই দিন দেখা গেল ; বেলা ১২ টার সময় বীচীহেড নামক স্থান দৃষ্টিপথে পড়িল। রাত্রি ৮ টার সময় টেমস্ নদীর মুখে জাহাজ নঙ্গর করে রহিল। টেমস্-নদী-মুখে আসিবার সময় দেখিলাম,—ডোভার, রাম্‌সগেট প্রভৃতি নগরে সারি গাঁথিয়া আলো জ্বলিতেছে ; বাঙ্গালি আমি সমুদ্রের বক্ষে দাঁড়াইয়া সেই আলোর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম ; কি অপূর্ব্ব !—ধরাতলে যেন অসংখ্য শুকতারার উদয় মনে হইল, বুঝি স্বাধীন দেশে পৃথিবীতেই নক্ষত্র-ফুল ফুটে ; অথবা কাঙ্গাল বাঙ্গালীকে লজ্জা দিবার জন্যই বুঝি স্বাধীনতা দেবী আজ মর্ত্ত্যকে স্বর্গ করিয়া সাজাইয়াছেন।

২৭শে টেম্‌স প্রবেশ করিলাম ; জাহাজে জাহাজে ছয়লাপ ; কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ কেহ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে—একেবারে যেন একটা জাহাজের হাট বসিয়াছে, দেখিবার এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দেখিতে দেখিতে গ্রেভ্‌সেণ্ড নামক স্থানে পৌঁছিলাম, সেখান থেকে

লণ্ডন নগর ১৬ মাইল। কিন্তু ভাটার জল কম পড়িয়াছে, জোয়ার না হইলে আর জাহাজ চলে না। সেই জন্য প্রায় সকল যাত্রী সেইখানে নামিল,—৩৭ দিন জাহাজ-বাসের পর এই প্রথম ডাঙ্গায় পা পড়িল; মনে হইতে লাগিল যেন জাহাজেই আছি ও গা সেই রকম টল্‌চে,—জাহাজ ছেড়ে ডাঙ্গায় এসেছি, এটা সহজে বিশ্বাস হইল না। তার পর এক ঝঞ্ঝাট; একটা সাহেব এসে আমাদের ব্যাগ বাক্স খুলিল; এটা হইতেছে —নিয়ম; কারণ যে সকল জিনিসের গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হয়, সে সকল জিনিস যাত্রীদের কাছে থাকিতে পারে। আমি ঘোড়গাড়ী ভাড়া করে গ্রেভ্‌সেণ্ড ষ্টেসনে গেলাম; ২॥০টার সময় রেলের গাড়ী চেপে প্রায় ৪টার সময় লণ্ডনে চেরিংক্রস ষ্টেসনে পৌঁছিলাম; একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া বেলা পাঁচটার সময় আমার নির্দ্দিষ্ট বন্ধুর গৃহে পৌঁছিলাম।

রাজধানী লণ্ডন নগর।

২২ শে ফেব্রুয়ারি।

২৭ শে বৈকালে লণ্ডন হইতে প্রায় ১৫। ১৬ মাইল দূরে গ্রেভ্‌সেণ্ড নামক স্থানে আমি জাহাজ হইতে নামি, এবং সেখান হইতে রেলের গাড়ি করিয়া লণ্ডনে চেয়ারিংক্রস নামক ষ্টেশনে বেলা ৪ টার সময় আসি। গ্রেভসেণ্ড হইতে চেয়ারিং-ক্রস পর্য্যন্ত আসিতে বোধ হইল যেন সকল ঘরেই আগুন জ্বলিতেছে ও ছাত দিয়া ধূঁয়া উড়ি-তেছে। ছাত আমাদিগের দেশের দুচালা ঘরের মত। গাড়িতে আসিতে আসিতে দেখিলাম, মধ্যে মধ্যে মাঠের স্থানেস্থানে সমুদায় সবুজ ঘাস-যুক্ত জায়গা পড়িয়া রহিয়াছে—দেখিয়া যেন চক্ষু যুড়াইয়া গেল। ক্রমাগত আধ মাইল একসা জমি দেখা যায় না—একবার উঠিতেছে, একবার নামি-তেছে, এই বরাবর। কিন্তু গাছগুলা সব পাতা-হীন, যেন পুড়িয়া গিয়াছে। কোথাও বা সুন্দর সুন্দর বলবান বালক বালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিলেই ভাল বাসিতে ও কোলে

করিতে ইচ্ছা হয় (ম্যালেরিয়া-ভোগা আধমারা ছেলে নহে)। এই সকল নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে চেয়ারিংক্রস ষ্টেশনে উপস্থিত হই-লাম। আমাদিগের দেশে যেমন কলিকাতা আসিতে হাবড়া-ষ্টেশনে রেলওয়ে কুলী থাকে, তাহারা গাড়ি চাপাইয়া দিয়া যায়, তেমনি নামি-বামাত্র একজন মুটে (Porter) আসিয়া আমার জিনিষ গুলি লইয়া আমার সঙ্গে, অথবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। যাইতে যাইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "সার্, হ্যানসম্ (hansom) অর্ ফোর হুয়িলার" (four wheeler) ? এখন জানা আবশ্যক, দুই রকম ভাড়াটিয়া গাড়ি পাওয়া যায়। এক রকম দুই চাকার ও হালকা, তাহার নাম হ্যান্‌সম্ (hansom), এই গুলি কিছু শীঘ্র যায়, সেই জন্য ভাড়া কিছু বেশী, দেখিতে কত-কটা আমাদিগের দেশের বগী গাড়ির মত। আর এক রকম গাড়ি চারি চাকার, তাহা পাল্কী গাড়ির মত, তাহার নাম ফোর-হুয়িলার (four wheeler) বা ক্যাব্। কলিকাতার ভাড়াটিয়া গাড়ি যেরূপ সচরাচর পাওয়া যায়,তার সঙ্গে এখানকার গাড়ির

তুলনাই হইতে পারে না, এখানকার গাড়ি এত ভাল। শীঘ্র যাইবার আবশ্যক থাকাতে আমি একখানি হ্যানসম্ লইলাম। গাড়ী ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া লণ্ডনের মধ্য দিয়া চলিল। যে লণ্ডনের কথা ছেলে বেলা থেকে পড়িয়া আসি-তেছি, যার মহিমা কত মহাজন বর্ণনা করিয়াছেন, যার বিষয় কতই কল্পনা করিয়াছি, বাস্তবিকই সেই লণ্ডনের মধ্য দিয়া চলিলাম। হাইড্‌পার্ক, রিজেণ্ট পার্ক ইত্যাদি যে সকল জায়গার কথা নভেলে পড়া গিয়াছে, সেই সকল জায়গা দিয়া যাইতে লাগিলাম। লণ্ডন দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হয় শুনিতে পাই, কিন্তু কৈ আমি ত আশ্চর্য্য হই নাই। হইতে পারে, আশ্চর্য্য হইবার বৃত্তিটী আমার বড় নাই। যে কারণে হউক, আমি দেখে হাত পা হারাই নাই। কলিকাতার ডাল-হাউসি-স্কোয়ার এবং গবর্ণমেণ্ট-প্লেসের ঐ খানটা মনে চতুর্গুণ জমকাল মনে করিয়া লও, তাহা হইলে লণ্ডনের অনেক জায়গার অবস্থাটা কতকটা বুঝিয়া লইতে পারিবে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে ৫ টার সময় নিরূপিত স্থানে পহুঁছিয়া দুইটী দেশীয়

বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তাতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া যে কত সুখী হইয়াছিলাম তাহা বলা যায় না। ৩৭ দিনের পর এই রাত্রে প্রথম বাঙ্গালা কথা কওয়া হলো,—ভেবে দেখ সেই বাঙ্গালা কথা কহিয়া কি আমোদ হইল।

রাজধানী লণ্ডন নগর।

৯ই মার্চ।

আমরা বেলা দশটার সময় একদিন বিলাতের রাজধানী লণ্ডন নগরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। এমনি কোয়াসা যে চারিদিক অন্ধকার,—দিন কি রাত বুঝা ভার,—সমস্ত দিনই এই রকম; রাস্তায় ভয়ানক কাদা—দুধারে যে ফুট-পাথ আছে তাহা কতকটা ভাল, কিন্তু এপার ওপার হবার সময় কাদা মাখা হতে হয়। এর উপর হাড় ভাঙ্গা শীত আছে। দু রকম গাড়ীর কথা বলিয়াছি, তা ছাড়া আর এক রকম গাড়ী আছে, তার নাম "ওম্‌নিবস্" (Omnibus); ইহার ভিতরে ও বাহিরে ৩০ জন লোক বসিতে পারে। কলিকাতায় যেরূপ ট্রাম্‌ওয়ে-কোম্পানি, সেইরূপ

'ওম্‌নিবস্'-কোম্পানি,—রাস্তায় ২। ৩ মিনিট অপেক্ষা করিলেই একখানী 'বস্' পাওয়া যায়। ছাতা দেখাইলেই গাড়ী থামে। তুমি উঠ, ভাল, খুব সস্তা। এ ছাড়া ট্রাম্‌গাড়ীও স্থানে স্থানে আছে। আবার মাটীর নীচে রেলের গাড়ী ও ষ্টেশন আছে—সেখানে প্রতি ১০ মিনিটে গাড়ী পাওয়া যায়, সহরের যেখানে ইচ্ছা যাও। এই ত সহরের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা। সহরের বাহিরে যাইবার জন্য যেমন কলিকাতায় দুটা ষ্টেশন আছে—শিয়ালদহ ও হাবড়া, এখানে কম বেশী ৯।১০টী ঐরূপ ষ্টেশন আছে।

টেম্‌স্ নদীতে প্রতি ১০ মিনিটে ষ্টীমার পাওয়া যায়। মনে করিও না যে, ডাঙ্গায় যখন এত রকম যান রহিয়াছে তখন ষ্টীমারে লোক হয় না, সেটা ভুল, এত লোক হয় যে তিলধারণের জায়গা নাই। আমি অনেক রকম যানে চড়িয়াছি; হাঁটারও কসুর নাই। কিন্তু হাঁটিতে হইলে একটা বড় বিপদ, চৌমাথা রাস্তার এপার ওপার হতে প্রাণ সংশয়; মধ্যস্থলে একটা করিয়া বসিবার স্থান আছে, তাহাতে অনেকটা সুবিধা,

তথাচ মারা পড়িবার খুব সম্ভাবনা। শুনিয়াছি ফরাসীদেশের রাজধানী পারিস নগরে এই রকম চৌমাথায় ঢেরা কাটার মত পুল আছে; সেই পুলের উপর দিয়া লোক এপার ওপার হয়। লণ্ডনে সেই রকম হওয়া উচিত। সেইদিন টাইম্‌স্ পত্রিকায় দেখিলাম, গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়ার সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে। যদি কোন স্থানে শীঘ্র যাইবার আবশ্যক না থাকে, তবে গাড়ীতে যাওয়া অপেক্ষা হেঁটে যাওয়ায় আরাম আছে। অল্পদূর গেলেই হাঁটার জন্য শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, এবং সেই উত্তাপের জন্য শীতের কষ্ট দূর হয়, ও চলিতে আরাম বোধ হয়। এখানে কোন রকমে শীত নিবারণ করিতে পারিলেই মহাসুখ। একদিন কোন স্থানে আমি 'অমনিবস্' চেপে যাইতেছি। এমন শীত বোধ হইতে লাগিল যে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। কাণ, পা, হাত জ্বালা করিতে লাগিল, শেষ গাড়ী ছেড়ে,—তবে বাঁচি—একটু চলিতে চলিতেই শরীর গরম বোধ হইল। আমি ত চলা উপভোগ মনে করি, আমাদের দেশের মত কর্ম্মভোগের

কাজ বোধ হয় না। শীতই এখানকার লোককে অলস হইতে দেয় না, আলস্য করিলেই শীত চাপিয়া ধরে। তাই ইংরেজ-জাতি এত কার্য্য-তৎপর, তাই তাহারা অবিরাম অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিতে পারে; এখানে দ্রুতপাদবিক্ষেপ, ঊর্দ্ধশ্বাসে একমনে গমন—দেখিয়া মনে হয় যেন প্রত্যেকেই এক একটী মহাকার্য্য উদ্ধারার্থ গমন করিতেছেন; 'কার্য্য কার্য্য কার্য্য'—ইহাই ইংরাজের এক-মাত্র বুলি,—অন্য কোন কথা নাই। ইংরেজ-জাতির এই কার্য্যতৎপরতা-গুণে মুগ্ধ হইয়াই বুঝি মহালক্ষ্মী ইংরাজের দ্বারে বাঁধা পড়িয়াছেন।

সাইরেণসেষ্টার।

২৩শে মার্চ্চ।

ভাই, এখন আমাদের দেশের অনেকেই পড়িবার জন্য বিলাতে আসিতেছেন; ক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইবে তার আর সন্দেহ নাই। এখানে আসাও থাকা সম্বন্ধে ২। ৪ কথা বলিব।

আসিবার সময় প্রথমেই আমরা একটী বড়

ভুল করি। পেণ্টালুন, চাপকান, চোগা ছাড়া বড় ভুল। সাহেব সাজা বড় ভুল। নূতন সাহেবী পোষাক পরিতে হইলে নানা দিকে ভুল হবার সম্ভাবনা। হয়ত গলার কলার্‌টা ভাল পরা হইল না,কি গলাবন্দটা একটু এদিক ওদিক হলো, না হয় কামিজের হাতা ভাল হয়ে বেরিয়ে রহিল না—কোন একটা সামান্য খুঁত হলে জাহাজের অপরাপর সাহেবরা টেপাটেপি করিতে লাগিলেন। যদি কোন নিতান্ত অসভ্য সাহেবের হাতে পড়, তিনি হয়ত তোমায় শুনিয়ে শুনিয়ে অন্যের কাছে তোমার মূর্খতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এতে সাহেবদের দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু বেশী দোষ কার? তুমি কেন তাহাদের পোষাক পর? তুমি সাধ করে সঙ্‌ সাজিতে যাও কেন? এসব না করে যদি তুমি চাপকান চোগা পর, তাহলে তোমার ভুল ধরিবার, তোমার অপমান করিবার কেহই নাই, তুমি যেমন করে ইচ্ছা পর—তাই ঠিক্। আর এক কথা, যে সাহেবি পোষাকে আমরা দেশে থেকে এখানে আসি, তাহা প্রায়ই ভাল হয় না। যদি এখানকার ভদ্রলোকের মত

থাকিতে চাও, তবে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াই তোমাকে ভাল কাপড় চোপড় তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। অতএব সাহেবী পোষাকে আসায় নানারকমে ভুল (১) সাহেবদের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া, (২) অনর্থক টাকাব্যয়, (৩) জাতীয়ত্ব নাশ।

তারপর ইংলণ্ডে আসিয়া কি পোষাকে থাকা উচিত, তাহা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি; সাহেবী পোষাকে থাকিতে চাও, এক সপ্তাহ মধ্যে বা তার চেয়ে কম দিনে পোষাক তৈয়ার করিয়া লও, অথবা দেশী পোষাকে থাকিলে, গৌরব বৃদ্ধি ব্যতীত কমিবার কোন কারণ নাই; আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার এই বিশ্বাস। আমাদের দেশের দুই একজন এই রকম দেশী পোষাকে কাটাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের যে বিশেষ কোন অসুবিধা হইয়াছিল বোধ হয় না। যদি কেহ আমার পরামর্শ লইতে চান, আমি বলিব যে আসিবার সময় জাহাজে দেশী পোষাকে আসা ভাল, পরে বিলাতে আসিয়া দেশী বিদেশী যেরূপ তোমার অভিরুচি সেইরূপ পোষাক পর। আরও এক কথা বলিতে পারি

যে, দেশী পোষাকে এখানে থাকিতে শঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ নাই। আমার এ কথাটা বোধ হয় অনেকের ভাল লাগিবে না—কেহ হয় ত বলিবেন—বা! সাহেব হতেই বিলাত যাওয়া, সাহেবী পোষাক পরিব না? তাঁর প্রতি আমার এই বক্তব্য যে তাঁর জন্য আমি মাথা ধরাই নাই।

তার পর থাকিবার কথা ও থাকিবার খরচ;—প্রত্যেকের দুটী করিয়া ঘর হইলেই সুবিধা, একটী বসিবার ঘর ও একটী শোবার ঘর। উপযুক্তরূপে সাজান দুটী ঘর লণ্ডনে সপ্তাহে ৯।১০, টাকার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। মফস্বলে যথা কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ডে, বা সাইরেণসেষ্টারে—সকল যায়গাতেই প্রায় সমান, যদি অল্পস্বল্প ইতর বিশেষ হয়।

সাধারণত বসিবার ঘরে একটী টেবিল (তাহার উপর আহার হয়); ছোট টেবিল দুই একটী, একটী ছোট বা বড় আল্‌মারি, ৪।৫ খানি গদি দেওয়া চৌকি, একখানি বা দুখানি আরাম চৌকি, একখানি সোফা, দুচারখানি ছবি ও আগুন রাখিবার জন্য একটী অগ্নিকুণ্ড থাকে। শোবার ঘরে এক এক খানি খাট সায় বিছানা, দু এক খানি

চৌকি, একটী টেবিল ও তার উপর একখানি আয়না; আর একটী টেবিল ও তার উপর মুখ ধুইবার পাত্র ও জল; ও একটি ড্রয়ার্—কাপড় চোপড় রাখিবার জন্য। এই রকম ঘরে আমাদের বেশ চলিতে পারে। পূর্ব্বে লিখিয়াছি—সপ্তাহে ৯।১০৲টাকায় এই রকম ঘর পাওয়া যায়। তবে যদি তুমি এখন নগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে থাকিতে চাও, বা খুব ভাল ঘর চাও, তার ভিন্ন বন্দোবস্ত। তার পর খাইতেও আন্দাজ ১২ শিলিঙে অর্থাৎ ৬৲ টাকায় বেশ চলিতে পারে। তাহা হইলে খাওয়া ও ঘরের জন্য সপ্তাহে ৩০ শিলিঙে অর্থাৎ মাসিক ৬০৲ বেশ চলিতে পারে। এখানে খাওয়াদাওয়ার জন্য তোমাকে নিজে কিছুই করিতে হইবে না। সকল বাসাড়ের বাড়ীতে একজন করিয়া Land Lady গৃহিণী আছেন, তাঁকে কেবল বলিতে হইবে, কি খাবার চাই ও কখন তিনি সেই সব খাবার প্রস্তুত করিয়া দিবেন। যে ঘরের ভাড়ার কথা বলিয়াছি, সেটা খাবার রেঁধে দেওয়া, খাবার টেবিলে এনে সাজিয়ে দেওয়া, প্রত্যহ জুতা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া

ইত্যাদি সব জড়িয়ে,—তজ্জন্য আর বেশী দিতে হয় না। এই হিসাবে খাওয়া ঘর ভাড়াতে বৎসরে ৭৮ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রা ৮০০৲ শত টাকা খরচ। পর, কাপড়চোপড়, কেতাব ও বাজে খরচ জন্য ২২ পাউণ্ড ধরে দিলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০ পাউণ্ডে অর্থাৎ বৎসরে এক হাজার টাকার কিছু উপরে বেশ চলে যায়। তার পর যে কালেজে পড়িবে, তার মাহিনা দিতে হইবে।

সাইরেণসেষ্টার।

৬ই এপ্রেল।

ভাই! বোধ হয় আমার উপর অনেকে চটিয়া লাল হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ হয় ত বলিতে-ছেন,—"আ ম'লো, ইংলণ্ডে গিয়া লোকটার বুঝি আর কোন কাজ নাই, তাই বাঙ্গালা কাগজ লিখিয়া পরকাল পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছে; লিখ্‌বি ত ইংরেজী কাগজে লেখ্; অভিশপ্ত, পতিত, পাপ-পূর্ণ বাঙ্গালা কাগজে কেন?" আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার যদি কিছু অপরাধ থাকে;

আমারও দুঃখ হয়, আমি বিলাতে এসেও মানুষ হইতে পারিলাম না কেন ? অনেকেই ত ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবামাত্র ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন ; আবার যাঁরা বিশেষ উপযুক্ত—ক্লেবর্—তাঁরা ত জাহাজ চেপেই ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। কৈ আমার দগ্ধ অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিল না কেন ? এখনও যে পোড়া বাঙ্গালা ভুলিতে পারিলাম না। ইংরেজী ভাল জানি না, দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালা এখনও মনে আছে, কাজেই বাঙ্গালায় লিখিতে বাধ্য হইতেছি।

আজ কাল প্রতি বৎসর দুইজন করিয়া বঙ্গবাসী কৃষিকার্য্য শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে আসিতেছেন। ইংলণ্ডের মধ্যে সাইরেণসেষ্টার কালেজ এ বিষয়ে প্রধান; লোকের ইহাই বিশ্বাস; সুতরাং বাঙ্গালার ছোট লাট তাঁহাদিগকে সাইরেণসেষ্টারে পড়িতে পাঠাইতেছেন। যাঁরা এখানে আসেন তাঁহাদের অনেকেই—অনেকে কেন ?—সকলেই—কালেজের পড়া শুনা, খরচপত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই সম্বন্ধে দুচার কথা লিখিলে মন্দ হইবে না।

প্রথম, কলেজে কি কি বিষয় পড়া হয়।

(১) কৃষিবিদ্যা হাতে কলমে শিখিতে হয়। (Theoretical and practical); (২) রসায়ন (Inorganic, organic, qualitative and quantitative analysis and agricultural chemistry)—অক্সিজান বাষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের গুণ ও তাহাতে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে আছে, সমস্ত স্বহস্তে করিতে হয়, চক্ষে দেখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয় না; (৩) উদ্ভিদবিদ্যা; (৪) ভূতত্ব; (৫) প্রাণী-তত্ব; (৬) ঘোড়া, গোরু, ভেড়া ইত্যাদির শরীরতত্ব ও চিকিৎসা; (৭) প্রকৃতিবিজ্ঞান (Physics); (৮) জমিমাপ; (Surveying) উঁচু নীচু পরিমাণ (Levelling); (৯) জমিদারী তত্বাব-ধারণ; (১০) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় আইন; (১১) গৃহ-নির্ম্মাণ (Building construction) ও গৃহ-নির্ম্মাণ উপযোগী পদার্থের গুণ বিচার (Strength of materials) এবং (১২) ইংরাজি ধরণে খাতা-লেখা। কৃষি-বিদ্যা সম্বন্ধে একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। চাষ বা কৃষিকার্য্য বলিলেই আমাদের দেশের লোকের মনে, ধান, গম, সরিষা, মটর, ইত্যাদি

শস্যের কথা উদয় হবে। কিন্তু এখানে কেবল তা নয়। চাষের উদ্দেশ্য মানুষের আহারোপ-যোগী দ্রব্য প্রস্তুত করা। আমাদের দেশের লোক কেবল চাল, ময়দা, ডাল, ইত্যাদি শস্য খাইয়া প্রাণধারণ করে, কাজে কাজেই চাষ দ্বারা সেই সকল জিনিস প্রস্তুত করা হয়। এখানে লোকের প্রধান খাদ্য মাংস, কাজেই চাষের এক প্রধান উদ্দেশ্য মাংস প্রস্তুত করা। যখন উদ্দেশ্য ভিন্ন হইল, তখন যে চাষপদ্ধতি ভিন্ন হইবে তার আর সন্দেহ কি ?

এখন কথা হইতেছে, জমী থেকে চাষ দ্বারা কি করে মাংস প্রস্তুত হয় ? এ বিষয়ে এখন দুচার কথা বলিব। এখানে কতক ভাল জমীতে গম ইত্যাদি মানুষের খাদ্য উপযুক্ত শস্য প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ জমীতে এমন শস্য সকল উৎপাদন করা হয়, যাহা মানুষের অভক্ষ্য, কিন্তু ভেড়া, গরু, ঘোড়া, শূকর ইত্যাদির সুখাদ্য। একজন লোকের যদি ৫০ বিঘা জমী থাকে, তবে ৩০ বিঘা আন্দাজ ভেড়া, গরু ইত্যাদির আহার প্রস্তুত করিবার জন্য ও ২০ বিঘা কি তার চেয়ে

কম, গম ইত্যাদির জন্য। সেই সকল শস্য খাইয়া ভেড়া ইত্যাদি পালিত হয় ও তৎপরে কসাইয়ের নিকট বিক্রীত হয়। এখানে ভেড়া ইত্যাদি চাষের প্রধান অঙ্গ। জমীতে গম যেমন হইতেছে, ভেড়াও তেমনি বাড়িতেছে। এখানকার লোক ভেড়াপালন ও শস্যের চাষ যে পৃথক্ পৃথক্ হয়, তা বুঝে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন চাষাও আছে, যাহার কেবল গরুর চাষ; অর্থাৎ তাদের জমীতে কেবল গরুর খাবার উপযুক্ত জিনিস প্রস্তুত হয় এবং সেই সকল জিনিস খাইয়া গাভী সকল পুষ্টকায় হইতে থাকে। তাহারা গাভী সকল কসাইকে বিক্রয় করে না, তাদের যে দুগ্ধ হয়, সেই দুগ্ধ হইতে পনীর, সর, মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত করে। এদেশে ভেড়া ইত্যাদি চাষের এত প্রাদুর্ভাব যে ঘেসো জমীর (অর্থাৎ যাহাতে কেবল ঘাস হয়) খাজনা চাষজমীর খাজনা অপেক্ষা অধিক। অতএব এখানকার চাষ আমাদের দেশের চাষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সকল শিক্ষার যে উপকার নাই, তা বলা মূর্খতা; তবে এই সকল জানিয়া আমাদের দেশের কত উপকার

হইবে, তাহা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। রসায়ন বিষয়টী উৎকৃষ্টরূপে শেখা হয়, স্বহস্তে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত করিতে হয়।

দ্বিতীয় থাকিবার নিয়ম ও ব্যয়ের হিসাব।

কলেজে ছেলে একশতের কিছু বেশী, তাহার মধ্যে অনেকেই কলেজে থাকেন, কেহ কেহ কলেজের বাহিরে সহরে বাসা করিয়া থাকেন। যাঁহারা কলেজে থাকেন, অবশ্য তাঁদের আহার, শয়ন ইত্যাদি সমস্ত কলেজে। শয়নঘর সম্বন্ধে দুই প্রকার বন্দোবস্ত আছে। এক রকম, এক একটী ছেলের এক একটী ঘর ও সেই ঘরে আগুন জ্বলে (শীতে আগুন ভিন্ন থাকা বড় কষ্টকর); আর এক রকম ঘর আছে, তাহা কাটের প্রাচীর দ্বারা কাম্‌রা কাম্‌রা করা; সেই এক এক কামরায় দুই জনের পড়িবার স্থান ও একটী কামরায় এক এক জনের শোবার ঘর, এই সকল ঘরে আগুন নাই। যাঁহারা প্রথমোক্ত আগুন সহিত বড় ঘর লয়েন, তাঁহাদিগকে প্রতি চারি মাসে কলেজের মাহিয়ানা সমেৎ ৫৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৭২৲ টাকা দিতে হয়;, যাঁহারা আগুনহীন ক্ষুদ্র ঘরে

থাকেন ও দুজন করে এক ঘরে পড়েন, তাঁহারা ৪৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৪০৲ টাকা প্রতি চারি মাসে দেন। যাঁহারা কলেজে থাকেন না, তাঁহাদিগকে কলেজের ফি বা মাহিয়ানা ২৫ পাউণ্ড অথাৎ ৩০০৲ টাকা প্রতি ৪ মাসে দিতে হয়। তাঁহাদের ঘর-ভাড়া ও আহারের ব্যয়ভার অবশ্য নিজে বহিতে হয়। তাহাতে (আহার ও বাটী) প্রায় সপ্তাহে ৩০ শিলিং অর্থাৎ ১৭৲ টাকা পড়ে।

আর এক কথা, যাঁহারা কালেজে থাকেন তাঁরা ছুটীর সময় কলেজে থাকিতে পান না, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নিজে নিজে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় এবং তার জন্য স্বতন্ত্র খরচ। প্রতি ৪ মাসে প্রায় ৪০ দিন ছুটি এবং সপ্তাহে ৩০ শিলিং বা ১৭৲ টাকা হিসাবে ৪০ দিনের ব্যয় ৮॥০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১০২৲ টাকা। অতএব যিনি কলেজে থাকেন ও আগুনযুক্ত ঘর লয়েন তাঁহার প্রতি ৪ মাসে ৬৪॥০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৭৪৲ টাকা লাগে; যদি আগুণবিহীন ঘরে থাকেন, তাঁহার প্রতি চার মাসে ৫৩॥০ পাউণ্ড অথবা ৬৪২৲ টাকা লাগে। যিনি কলেজে থাকেন না, তাঁহার প্রতি চার মাসে প্রায়

কলেজের মাহিনা ৪৪॥০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৩৪৲ টাকা লাগে। এই হিসাবে প্রতি ছাত্রের বৎসরে ১৯৩॥০ পাউণ্ড (২৩২২৲ টাকা); বা ১৬০॥০ পাউণ্ড (১৯২৬ টাকা); বা ১৩৩॥০ পাউণ্ড (১৬০২৲ টাকা) লাগিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পোযাক, পুস্তক, ও অন্যান্য খরচ জন্য বৎসরে ৫০ পাউণ্ড প্রায় ৬০০৲ টাকা ধরা যাইতে পারে। একটা কথা বলা আবশ্যক। যাঁহারা কলেজের বাহিরে থাকেন তাঁহাদের কিছু অসুবিধা আছে। কলেজের চতুর্দ্দিকেই কলেজের জমী, সেই সকল জমীতে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে অনেক শেখা যায়, যাহঁরা কলেজের বাহিরে সহরে থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সকল জমীতে সর্ব্বদা আসা ঘটে না, কারণ, কলেজ হইতে সহর প্রায় ১॥০ মাইল দূর।

কালেজে কতদিন পড়িতে হয়?

২১শে এপ্রেল।

সাইরেণসেষ্টার কলেজে পড়িবার খরচের হিসাব গতবারে দিয়াছি। কতদিন কলেজে পড়িতে হয়, এবারে তাই বলিব। কলেজের

নিয়ম অনুসারে প্রতি বৎসর তিন সমান ভাগে বিভক্ত; এই এক এক ভাগের নাম "টার্ম"। অতএব প্রতি টার্মে ৪ মাস। প্রত্যেক টার্মে ১১ কি ১২ সপ্তাহ পড়া হয়, বাকী ৫ কি ৬ সপ্তাহ অবকাশ। সর্ব্বশুদ্ধ ৪ টী শ্রেণী, তন্মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণী,—প্রত্যেক শ্রেণী দুই উপভাগে বিভক্ত, ৪র্থ ক্লাসটির আর উপর নাই। এক এক টার্মে এক একটী উপভাগ শেষ হয়, অর্থাৎ দুই টার্মে এক একটী শ্রেণী শেষ হয়। কলেজ আউট্ হইতে এই হিসাব অনুসারে দুই বৎসর ৪ মাস আবশ্যক। আমাদের দেশের কলেজে বা স্কুলে বৎসরের গোড়ায় আরম্ভ না করিলে, বৎসরটা মাটি; এখানে "টার্ম" থাকাতে সে অসুবিধা নাই। বড় জোর ৪ মাস নষ্ট হইতে পারে। আমাদের ছেলেপিলেরা যদি একবার কোন পরীক্ষায় ফেল হইল, তাহা হইলে আর এক বৎসর না গেলে, তাঁর আর পরীক্ষা দিবার যো নাই। সাইরেণসেষ্টার কলেজে প্রত্যেক টার্মের শেষে পরীক্ষা হয়। অন্যান্য কলেজেও এখানে প্রায় এই রকম। লণ্ডনবিশ্ববিদ্যালয়

কলেজে এইরূপ বৎসরে দুইবার পরীক্ষা হয়। আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা এখান থেকে শিক্ষা পেয়ে গিয়াছেন, তাঁহাদের যে ইহা অবিদিত আছে তাহা নহে, তবে কেন এই সুবিধাটী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই বলিতে পারি না। ছাত্রের সংখ্যা অধিক এইরূপ আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু সে আপত্তির কি খণ্ডন নাই ?

লিওপোল্‌ডের বিবাহ ও ডারউইন।

২৮শে এপ্রেল।

একটা কথা আছে, নানা ফুলে সাজি ; এবারে তাই করিলাম। প্রথমে দুই একটা সংবাদ দেওয়া কেমন বোধ কর ? গত কল্য মহা সমারোহে কুইন-ভিক্টোরীয়ার কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স লিওপোল্ডের সহিত প্রিন্সেস্ হেলেনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকেই কালই অপরাহ্নে এক স্পেশল্-ট্রেণে ফিরিয়া আসেন। পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে একখানি টিকিট পাওয়া যাইতে পারিত, কারণ আমরা বিদেশী। টিকিট না পাওয়ায় বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারা যায় নাই। যখন

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকল ষ্টেষনে ফিরিয়া আসেন, তখন দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশের লোকই যে খুব জাঁকজমকে পোষাক পরেন, তা নয়। কত লর্ড ও লেডী দেখিলাম; তাঁহারা নানা অলঙ্কার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিত। মনুষ্যপ্রকৃতি সকল স্থানেই সমান। আমার সঙ্গে এমন কোন লোক ছিলেন না, যিনি দেখাইয়া দেন, ইনিঅমুক, ইনি অমুক, সেইজন্য দেখিয়া যে বিশেষ কোন ফল হইল, তাহা বোধ হয় না। এই বিবাহ উপলক্ষে ইউরোপীয় অনেক রাজা রাজড়া ও রাজাদের দূত আসিয়াছেন। বিবাহের পূর্ব্বে উইন্‌সর রাজবাটীতে এক ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে আমাদের দেশের টিপু সাহেবের নিকট হইতে গৃহীত বহুমূল্য ভোজপাত্রের উল্লেখ প্রথমে দেখিলাম। এই সকল দেখিয়া মনের যে কি ভাব উদয় হইল, বুঝিতে পার।

উপরের সংবাদটি সুখের, কিন্তু আর একটী বড় দুঃখের সংবাদ লিখিতেছি। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ জগৎ বিখ্যাত ডারউইনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯শে এপ্রেল বুধবার এই দুর্ঘটনা

ঘটে এবং ২৬শে এপ্রেল তাঁহার সমাধি হইয়াছে। সমাধি যে, ওয়েষ্টমিনিষ্টার-আবিতে হইয়াছে তাহা লিখিয়া জানান বেশীর ভাগ। ইংলণ্ডের যত বড় লোক প্রায় সকলেই সেদিন সমাধিস্থানে উপস্থিত ছিলেন। একদিন তাঁহার সমাধি দেখিতে যাইব মনে করিতেছি। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমি তাঁহাকে এক পত্র লিখি; তিনি উত্তরে লেখেন, আহ্লাদের সহিত আমার সহিত দেখা করিবেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিল না।

আমার কোন এক আত্মীয়ের নয় দশ বৎসরের পুত্র একবার একখানি পত্রে লেখেন "আপনি লণ্ডনের বর্ণনা আমাকে লিখে পাঠাবেন।" বাল্য-কালসুলভ এই কৌতূহল দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, কিন্তু কি উত্তর দিব কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে, এক ছত্রে একটী সুন্দর বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে;— "লণ্ডন 'বিজ্ঞাপনের' নগর"। যিনি একবারমাত্র লণ্ডনের রাস্তায় চলিয়াছেন বা রেল গাড়ীতে চাপি-য়াছেন, তিনিই আমার কথার সার্থকতা অবিলম্বে

বুঝিবেন। যে দিকে চক্ষু ফিরাও, সেই দিকেই দেখিবে—বিজ্ঞাপন। বিশেষ রেলওয়ে ষ্টেষণে; নূতন লোকের পক্ষে বিজ্ঞাপন অতি কষ্টকর ও ভ্রমজনক। ষ্টেষনের যে দিকে দেখ, কেবল বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ; কোন ষ্টেষনে আসিলে তাহার নাম খুঁজিয়া লওয়া বড় দুষ্কর,—কোন্‌টি বিজ্ঞাপন কোন্‌টি ষ্টেষনের নাম, কি করিয়া বুঝিবে? এই সকল বিজ্ঞাপনের মধ্যে খবরের কাগজের ও থিয়েটারের বিজ্ঞাপন অধিক। গাড়ীর মধ্যেও বিজ্ঞাপন; এখানকার লোকেই বিজ্ঞাপনের অর্থ ও কার্য্যকারিতা বুঝে।

আমার কোন পরিচিত বন্ধু একবার টাইমস্ পত্রিকায় এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন—"বিদেশী যুবাপুরুষ লণ্ডনস্থ কোন ভদ্র পরিবার মধ্যে কিছু দিন থাকিতে ইচ্ছা করেন।" টাইম্‌সপত্রে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার দুই দিন পরেই একদিন প্রাতঃকাল হইতে ৮টা পর্য্যন্ত তাঁহার ঘর চিঠিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হয় চিঠির সংখ্যা দেড় শতের কম নহে। আমি সেই সকল চিঠি পড়িয়াছি, "পিক্‌উইক্-পেপার" উপন্যাস পড়ে

আমার যত না আমোদ হইয়াছিল, এই সব চিঠি পড়িতে তাহার চতুর্গুণ আমোদ হইল। প্রথমে দেখিলাম যে, দুই একখানি ব্যতীত সমস্ত চিঠিই স্ত্রীলোকদ্বারা লিখিত। পত্রবিভাগের কার্য্য বোধ হয় এখানে বাটীর গিন্নীদের উপর নির্ভর। সকল পত্রেই লেখা যে, আমার বাটীতে আসিলে যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং যতদূর সুখে রাখিতে পারি চেষ্টা করিব। অনেক পত্রেই লেখা যে আমার পরিবার মধ্যে এক, দুই বা ততোধিক প্রাপ্তবয়স্কা রূপবতী কন্যা, ভ্রাতষ্পুত্রী বা অন্য কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক বাস করেন;—আমরা সকলেই গীতবাদ্যানুরাগী, আমাদের অনেকে প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কা, আমরা সকলে আমোদ আহ্লাদে মনের সুখে কালাতিপাত করি। কেহ কেহ বা তাঁহাদের পরিবারস্থ নবযৌবনপূর্ণা স্ত্রীলোকদের বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিয়াছেন। আমাদের দেশে এখনও এতদূর সভ্যতা হয় নাই!

এই ত চিঠির এক দিক দেখিলে, অপর দিক দেখিলে এখানকার স্ত্রীলোকদের বুদ্ধির ও শিক্ষার

সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পত্রে লেখা যে, আমার বাটী উচ্চ ও শুষ্ক স্থানে অবস্থিত, সম্মুখে ময়দান খোলা, লোকের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে শেষ তালিকা লওয়া হয়, তাহাতে এই পল্লী খুব স্বাস্থ্যকর প্রমাণ হইয়াছে—ইত্যাদি। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সাধারণ শিক্ষা কত অধিক।

সমাধিক্ষেত্র ও সমাজিক কৃত্রিমতা।

১২ই মে।

ভাই, ইংরাজদের কীর্ত্তি সকল দেখিয়া স্তম্ভিত না হইয়া কে থাকিতে পারে? যেদিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই ইহাঁদের ধনের, বুদ্ধির ও অধ্যবসায়ের পরিচয়। সেদিন আমি ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার সমাধিমন্দির দেখিতে যাই। বাল্যকালে এডিসনের স্পেক্‌টেটার নামক পুস্তক পড়িয়া জানিয়াছিলাম যে, ইহাতে ইংলণ্ডের রাজা রাজড়া, যোদ্ধা, কবি ইত্যাদি বড় বড় লোকের সমাধি হইয়া থাকে। এবং সেই সময় হইতে এই স্থানটীর উপর আমার মনে একটা প্রগাঢ় ভক্তির

উদয় হয়। একদিন সময় পাইয়া দেখিতে যাই। মনে মনে যেরূপ চিত্র করিয়াছিলাম, বাস্তবিক তাহাই দেখিলাম। প্রবেশ করিয়াই সমাধি মন্দিরের উচ্চতা, বিস্তার ও শিল্পকার্য্য প্রথমে নয়নগোচর হইল। অধিক সময় ছিল না, সেই জন্য মন্দিরের শোভা ভালরূপে দেখিতে পারিলাম না। সমাধিতে লোক সকল দেখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই কবি ও পণ্ডিতদের প্রতিমূর্ত্তি, তন্মধ্যে সেক্সপিয়ার, সদে, ড্রাইডেন্ ও গ্রোট বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিলাম; ক্রমে স্যার আইজাক্ নিউটন নয়নগোচর হইলেন। স্যার আইজাক্ নিউটনের নিকটেই হার্শেলের পার্শ্বে পণ্ডিতবর ডারউনের নূতন সমাধি দেখিয়া যুগপৎ ভক্তি, বিস্ময় ও কষ্টের উদয় হইল। যেদিন সমাধি হয়, তার পর দিন আমি দেখিতে যাই। দেখিলাম সমাধির উপর টিকিট দেওয়া ফুলের মালা বিস্তার করা রহিয়াছে। টিকিট পড়িয়া দেখিলাম, একগাছি মালা মহারাণী পাঠাইয়াছেন এবং অপরাপর বিজ্ঞানসভা এক এক গাছি ফুলের মালা পাঠাইয়া মৃত ডারউই-

নের সম্মান করিয়াছেন। অল্প দূরেই চার্লস লায়েল রহিয়াছেন দেখিলাম। যখন যাঁহাকে দেখিলাম তখন যেন আমাকে তাঁহার সমকালবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকল লোকের নাম দিবার স্থান নাই এবং আবশ্যকও নাই। ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় অনেক বড় লাট, কাপ্তেন ও বড় বড় রাজমন্ত্রীদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। তৎপরে রাজ-সমাধি অংশে গিয়া সপ্তম হেনরি, প্রথম এডওয়ার্ড, কুইন এলিজাবেথ্, কুইন মেরী প্রভৃতি অনেক রাজা ও রাণী যুগপৎ দর্শন করিলাম। আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে, রাজদর্শনে পুণ্য হয়, অতএব মৃত রাজদর্শনে পূর্ণ মাত্রায় না হউক, কতকটা ত হবার সম্ভব। ওয়েষ্টমিনিষ্টার মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব পুরোহিত মহামান্য ডীন্ ষ্টেন্‌লি রাজাদের সহিত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই মন্দিরে ইংলণ্ডের রাজা ও রাণীদের অভিষেক হইয়া থাকে, এবং সেই জন্য অভিষেক-সিংহাসন এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। অভিষেক-সিংহাসন উল্লেখ করিলে সুন্দর দৃশ্য দেখিবার আশা হয়, কিন্তু সে আশা বৃথা। এ

সিংহাসন সেরূপ নয়, "একখানি পোকা-খেকো, ভাঙ্গা, রঙওঠা, বেঢপ, বহু পুরাতন বড় চৌকি।" কেমন, এ বর্ণনায় সন্তুষ্ট ত? সিংহাসন ও সিংহাসনের নিম্নে স্কট্‌লাণ্ড হইতে আনীত সেই প্রস্তরখানি—এ দুইটী জিনিস ঐতিহাসিক চক্ষে অবশ্য আদরণীয়।

সকল সমাজেরই দোষ গুণ আছে, তবে দোষ অগ্রে চক্ষে পতিত হয়। যদি কোন দোষের কথা লিখি, তাহা হইতে মনে করিওনা যে প্রশংসার কিছু নাই। ইহাঁদের সমাজ অত্যন্ত কৃত্রিম (artificial) বলে বোধ হয়। আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, এদেশী মাতা তত ভাল বাসিতে জানেন না, এদেশী ভগ্নী, ভ্রাতার শুশ্রূষা করিতে তত তৎপর নহেন, এদেশী ভাই, ভগ্নীর প্রিয় নন, এদেশী পুত্রের সহিত পিতা মাতার তত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বা ভালবাসা-মাখান ভাব নাই। এইরূপ সংস্কার কোথা হইতে হইল, বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহার আর সন্দেহ নাই। এখানকার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, ভালবাসা ও সহৃদয়তাতে

আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হউন, কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। তবে প্রভেদ এই, আমাদের পারিবারিক স্নেহ ও সহৃদয়তা মুখে প্রকাশ করি না, অথবা প্রকাশ করিতে জানি না; আমার ভগ্নী আমাকে ভালবাসেন, ভালবাসা মনে মনেই রহিল, আবশ্যক হইলে কার্য্যে প্রকাশিত হইবে; কিন্তু এ দেশের পারিবারিক স্নেহ প্রকাশের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হয়। প্রাতঃকালে প্রথম দেখা হইবার সময় পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভগ্নীর পরস্পর করমর্দ্দন বা স্নেহচুম্বন—প্রথা কেমন বোধ হয়? রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার সময়ও এই প্রথা। যদি ভ্রাতা, ভগ্নীর নিকট হইতে কোন একটা জিনিষ চাহিয়া পাঠাইলেন, প্রাপ্তিস্বীকার স্বরূপ ধন্যবাদ না দিলে, মহা অসভ্যতা হইল। ইহাকে কৃত্রিমতা না বলিয়া কি বলিব? ঘনিষ্ট লোকদের মধ্যে যখন এরূপ, তখন দূর সম্পর্ক, বা নবপরিচিতের মধ্যে কত অধিক আড়ম্বর তাহা অনায়াসে বুঝিতে পার। তোমার সঙ্গে কোন লোকের আলাপ করিতে হইলে একজনের ত প্রথমে পরিচয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

তৎপরে উভয়েই পরস্পর করমর্দ্দন করিতে হইবে, এবং সেই সময়ে উভয়েই বলেন, "হা ডি ডু" (হাউ ডু ইউ ডু) (how do you do); ইহার অর্থ, "তুমি কেমন আছ;" কিন্তু এস্থলে ইহার কোন অর্থ নাই, ইহার উত্তর দিবার আবশ্যকও নাই, তবে সমাজের পদ্ধতি মত না চলিলে লোকের উপলব্ধি হইবে, সভ্যসমাজের রীতি নীতি এখনও তোমার শিক্ষা হয় নাই। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে এই সম্বোধন করিয়া হস্তকর্ষণ করিতে হয়। আমার বলার এ অর্থ নহে যে, ইহাঁদের আন্তরিক ভালবাসা নাই; আমি কেবল ইহা বলিতে চাই যে, কেবল আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া ইহাঁরা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন দ্বারা সেই আন্তরিকতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। নবাগত লোক এই কৃত্রিমতা দৃষ্টে স্থির করেন যে, ইহাঁদের মধ্যে আন্তরিকতা নাই; কিন্তু আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে লিখিলাম।

লণ্ডন।

১৫ই মে,

আজকাল কোন কোন দিন শীত বেশী এবং কোন কোন দিন শীত কম হয়। এক একদিন সুন্দর রৌদ্র হয়। সেই দিন বেড়ান বড় আরামের। যখন আমি প্রথম আসি, তখন কোন গাছেরই পাতা ছিল না, সব গাছ যেন পুড়িয়া গিয়াছিল, আজকাল ঠিক তাহার বিপরীত। সকল গাছেই নূতন পাতা বাহির হইয়াছে এবং ফুল ফুটিতেছে। দেখিতে কি মনোহর! যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই একেবারে রাশি রাশি ফুল। ঘাসের সঙ্গে শত শত সুন্দর ফুল। এখানে শীতের প্রাদুর্ভাবের জন্য সব গাছের ফুল এই ৩।৪ মাসের মধ্যে ফুটে, আবার শীতে সব শুকাইয়া যায়, সেইজন্য একেবারে এত ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বার মাসই কোন না কোন গাছে ফুল হইতেছে। এখানে তা নয়; তোমরা এখন রৌদ্রে গ্রীষ্মে বর্ষায় ব্যতিব্যস্ত, আমরা শীতে সুখভোগ করিতেছি।

আর একদিন কিউগার্ডেন নামক একটী বাগান দেখিতে যাই। সেখানে পৃথিবীর সকল দেশের গাছ আছে। শীতের জন্য আমাদের দেশের গাছ এখানে জন্মিতে পারে না। সেই জন্য বড় গ্লাসের ঘর আছে এবং ঘরের নীচে দিয়ে লোহার পাইপ বা নল দ্বারা সর্ব্বদা গরম জলের বাষ্প যাইতেছে। এই উপায়ে সেই ঘরের উত্তাপ আমাদের দেশের মত। সেই ঘরের মধ্যে তাল, নারিকেল, কলা, ইত্যাদি আমাদের দেশের নানা জাতীয় গাছ হইতেছে।

আর এক দিন এখানকার থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আর একদিন না গিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতি সুন্দর চিত্র সকল জীবিত বলিয়া বোধ হয়। আমার এত কঠিন হৃদয়, তথাচ আমার কান্না পাইয়াছিল। তবু আমরা সব ইংরাজি বুঝিতে পারি না। এদেশের ছোটলোকের ইংরাজি কথা বুঝা বড় কঠিন, এদেশের ভদ্র-লোকেরাই বুঝিতে পারে না, আমাদের কথা স্বতন্ত্র।

এখানে স্নান করিবার জন্য Public bath অর্থাৎ সাধারণ স্নানাগার আছে। সেখানে গিয়া টিকিট লইতে হয়। টিকিট লইয়া একটা ঘরে যাইতে হয়, সেই ঘরে যাইবামাত্র একজন আসিয়া তোমার টিকিট লইয়া তোমাকে একটা ঘরে ঢুকিতে বলে। ঘরের মধ্যে কাঠের চৌবাচ্ছা আছে, সেই চৌবাচ্ছা জলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। টাণ্ডাজল বা গরমজল—যা চাও। এক ঘণ্টা ঘরের মধ্যে থাকিতে পারা যায়। তোয়ালে, আরসি, বুরুষ, চিরুনি, ইত্যাদি সকলই সেই ঘরে আছে। স্নান করিতে বড় আরাম,—শরীর মন স্নিগ্ধ হয়। তবে ওরূপ স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া স্নান করা দরিদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে সকল সময় ঘটে না। তবে এক আধবার স্নান করিয়া সকলের সক্ মিটান উচিত।

নিমন্ত্রণ।

ভাই! আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক আচার ব্যবহার সাহেবদের সহিত যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা বোধ হয় মোটামুটি অনেকেই জানেন। কিসে কতদূর ভিন্ন, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলে সেই প্রভেদ আরও বুঝা যাইবে। আমাদের দেশের ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা প্রায় কেহই গান, বাজনা, নাচ জানেন না; কিন্তু এখানে যে রমণী ভাল গান বাজনা না জানেন, তিনি ভাল শিক্ষিতা বলিয়া পরিচিত হয়েন না। এখানে পিয়ানো বাজানটা মেয়েদের একচেটে বলিলেই হয়। মেয়ে-মহলে পিয়ানো বাজানর এত ধূমধাম যে, বালিকারা ৫ বৎসর হইতে ইহা শিখিতে আরম্ভ করে। আমি ২।৩টী সাত আট বৎসরের মেয়েকে সুন্দর পিয়ানো বাজাতে দেখিয়াছি; কচি কচি মেয়েগুলি হাসি হাসি অধরে কোমল অঙ্গুলি চালনা করিয়া যখন ধীরে ধীরে পিয়ানোতে ঘা দেন, তখন ভাই! মনে এক

অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়। নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে দেখিবে, তুষার-ধবলাঙ্গী বেশভূষায় ভূষিতা যুবতীগণের মধ্যে পিয়ানো বাজানর মহামহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য আমাদের দেশের নিমন্ত্রণ খাওয়ার প্রথা এদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের দেশের প্রথা—নিজ পরিবার মধ্যেই হউক, আর পরের বাড়ী সামাজিক নিমন্ত্রণেই হউক, পুরুষদের খাওয়া হইলে তবে স্ত্রীলোকদের খাওয়া হইয়া থাকে; পরিবার মধ্যে ত কথাই নাই, পুরুষদের খাইয়া যদি কিছু বাঁচে ত মেয়েরা খাইবে। কিন্তু এদেশের নিয়ম কিরূপ মনে কর?—সব উল্টা। মনে কর, এখানে যদি কেহ সন্ধ্যার পর ৮টী মেয়ে এবং ৬টী পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিল (বলা বেশীর ভাগ, যে, ভদ্র পরিবার মধ্যে এখানে প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে) তাহা হইলে সেই ১৪টী নরনারী আসিয়া প্রথমে একত্রে গান করিবেন, পিয়ানো বাজাইবেন, সাধু ভাষায় সাধুভাবে রসিকতা করিবেন,—কিছুক্ষণের জন্য নানা আমোদ প্রমোদ চলিতে থাকিবে। তারপর ক্রমে মেয়েরা সকল

পিয়ানাগুলি একচেটে করিয়া লইলেন, মধুর রবে চারিদিক আমোদ করিয়া পিয়ানো বাজিতে লাগিল। তখন নবীন সুরসিক পুরুষগণ যেন তটস্থ হইয়া সেই রমণীগণের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়া-লেন,—আর ধীরে ধীরে অতি বিনম্রভাবে বাদ্য-কারিণী রমণীগণের সম্মুখস্থিত বাজনার কেতাবের পাতা উল্টাইয়া দিবার সুখভোগ করিতে লাগি-লেন। বাজনার এক একটা গৎ শেষ হইলে পুরুষ-শ্রোতৃগণ একযোগে তারস্বরে "ধন্য রমণী! ধন্য রমণী!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিলেন। তুমি সে বাজনা শুন, আর নাই শুন, ঘুমাইয়া থাক, আর জাগিয়াই থাক, ধন্যবাদ দিবার সময় "ধন্য! ধন্য!" বলিয়া উঠিতে হইবে, নচেৎ মহা অসভ্যতা হইবে। আবার বাজনা শুনিতে শুনিতে যিনি ঘুমাইয়া পড়েন, তিনি ধন্য-বাদে বিশেষ পটু—সে সময় তাঁহার তীব্র চীৎকার সকল শব্দকে ভেদ করিয়া উঠে।

এইরূপ আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্ষুধার উদ্রেক হইতে লাগিল। তখন বাটীর যিনি চাক্‌রাণী, তিনি চা, দুধ, চিনি, পিঠে, মদ ইত্যাদি

আনিয়া দিয়া গেলেন। পরিবারের মধ্যে একজন বাটীতে বাটীতে চা এবং গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। মেয়েরা সব নিজের নিজের চৌকিতে গিয়া বসিলেন। তখন পুরুষগণ মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল; কেহ চায়ের পিয়ালা, কেহ পিঠের রেকাব্, কেহ বিস্কুটের থালি, কেহ মদের গ্লাস লইয়া শ্রীমতীদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"আপনি কি অনুগ্রহ করে ইহা লইবেন?"—রমণী যদি লইলেন, তাহা হইলে অনুগ্রহের আর সীমা রহিল না। তিনি যদি না লইলেন, তবে হতভাগ্য পুরুষ বেছারা মুখ আছাড়ে ফিরে এসে সময়ান্তরে পুনরায় চেষ্টা করিবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। যদি কোন পুরুষের স্ত্রীলোককে সাহায্য করিবার কোন কার্য্য না রহিল, তবে তিনি ম্লানমুখে ঘরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মেয়েদের যখন চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রূপে আকণ্ঠ আহার হইল, তখন তোমার আমার খাইবার অবসর উপস্থিত—পুরু-ষের খাওয়া যখন হোক এক সময়ে হইবে; আসল কার্য্যত হইয়া গিয়াছে—পুরুষ-নৌকার-কাণ্ডারী-

পৃথক স্থান (Gallery) আছে, এই স্থানের সম্মুখেই রিপোর্টারদের স্থান, স্ত্রীলোকদর্শকেরও পৃথক্ স্থান আছে। সভা ভঙ্গ পর্য্যন্ত আমি তথায় ছিলাম। ছেলে বেলা হইতে পড়িয়া আসিতেছিলাম, লর্ড চেনসেলার "উল সেকে" বসেন, উলসেক বলিলেই তাঁহাকে বুঝায়। আজ সেই উলসেক (wool sac) দেখিলাম। লর্ড সল্‌সবেরীর (Salisbury) বক্তৃতা শুনিলাম, কিন্তু দর্শকদের স্থান হইতে শুনিবার বড়ই অসুবিধা; বড় গোলযোগ; বক্তৃতা হইতেছে, এমন সময় গল্প, হাসি, বাহিরে লোকের গোল-মাল। প্রকৃত হাটের মত; কেহ আসিতেছে কেহ যাইতেছে; সবই গোলমাল। যখন সভা বসে নাই, তখন কমন্সহাউস ও লর্ডহাউস ও পার্লে-মেণ্টের অপরাপর অংশ দেখিয়াছি। লর্ডহাউস কমন্সহাউস অপেক্ষা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং আসবাবও ভাল। কমন্সহাউসের অধিবেশন দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি করি এবার হইল না; আশা লর্ডহাউস দেখা আর না দেখা উভয়ই প্রায় সমান। লর্ডহাউসের এমনি মান যে কথায় কথায় কমন্স হাউসের সভ্যেরা ইহাকে তুলিয়া

দিবার প্রস্তাব করেন, কাগজে এইরূপ প্রস্তাব ত প্রায়ই দেখা যায়।

শীত।

ভাই! এখানকার শীতের কথা লিখিতে বলিয়াছ। শীতের কথা অধিক আর কি বলিব? শীতে অঙ্গ অবশ, অঙ্গুলিগুলি পক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় অবসন্ন, যত পোষাক আঁট—তবু শীতে তোমার অন্তর গুর্ গুর্ করিবে। এমনি দারুণ কোয়াসা যে দুই হাত অন্তরে মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি নিজের হাত বাড়াইলে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রে ছাদে বরফ, ঘরের পাশে যরফ, উঠানে বরফ, কাঁচা জলে হাত দিলে হাত যেন কাটিয়া লয়। শীতকালে অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে আরও শীত ধরে। হাঁটাহাঁটি, প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমে আরাম আছে। সেই জন্য ইংরেজ জাতি অলস হইতে পারে না।

শীতকালে গাছের একটীও পাতা থাকে না, একটীও ফুল থাকে না—মনে হয় যেন গাছগুলি

মরিয়া গিয়াছে,—কাটিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করিবার উপযুক্ত বোধ হয়। ঘাস সব শুকাইয়া জ্বলিয়া যায়; কিন্তু যেই শীত ফুরাইল, অমনি যেন যাদু-মন্ত্রবলে হটাৎ বৃক্ষের ফুল, ফল পাতা হইল।—এইটী আমাদের চক্ষে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। শীতান্তে এখানে কি মানুষ, কি বৃক্ষ সকলে যেন নবজীবন প্রাপ্ত হয়। কচি কচি ঘাস বড় বাহার দিয়া বাহির হইতে থাকে—ঘাসের সঙ্গে একরকম হলুদ রঙের ফুল জন্মে,—সেই ফুল ঘাসকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, সে স্বর্গীয় শোভা মুনি ঋষির মন হরণ করিতে পারে, আমরা ত কোন্ ছার?—তখন স্ত্রীপুরুষ বালকসকলেরই প্রফুল্লিত গণ্ডস্থল। ইংরেজ বড় ফুল ভাল বাসে—ফুল তুলিতে তাহাদের বড় আমোদ,—নব্যসম্প্রদায় ফুল লইয়া জামার বোতামে গুঁজিয়া রাখে, স্ত্রীলোকে ফুলের তোড়া তৈয়ারি করিয়া পিতা, ভ্রাতা, স্বামীকে উপহার দেয়,—ফুলের হাটে ফুলের খেলা পড়িয়া যায়। ইংরেজ ফুলের মাহাত্ম্য যত বুঝে, আমরা তত বুঝি না, তাই ফুলের তত আদর করি না।

শীতের পর যে বসন্ত তাহা এখানে; আমাদের

দেশে নাম মাত্র। আমাদের বসন্তের চিহ্ন কি? কবিরা বলিবেন, কোকিল কূজন আরম্ভ করিল, চূতপুষ্প আস্বাদনে সাধের কোকিলের গলা ভাঙ্গিল; কিন্তু আমরা মোটামুটী এই বুঝি যে, শীত কমিয়া গ্রীষ্মের আরম্ভ হইলে, দু একটা গাছের নূতন পাতা হইল। কিন্তু এখানকার শীতের পর বসন্ত কিরূপ? কি উপমা দিয়া বুঝাব অন্বেষণ করিতে করিতে একটি কথা হটাৎ মনে পড়িল; যদি তাহাতে কোন দোষ বোধ কর, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, উপমাটি বড় সার্থক তাই দিলাম। আমরা হিন্দুর ছেলে, অবশ্য ৺ জগন্নাথদেবকে জানি; জগন্নাথদেব কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যে মধ্যে "নূতন কলেবর" ধারণ করেন, তাহাও জানি; ইংলণ্ডও সেইরূপ বসন্তে "কলেবর পরিবর্ত্তন" করিয়া থাকেন। অনেকটা ফুলের কথা বলিলাম, আর বাড়াবাড়ি করিলে হয়ত তুমি আমার উপর বিরক্ত হইবে, এবং ফুলের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিবে। আমার উপর বিরক্ত হইলে ত ক্ষতি নাই, কিন্তু ফুলের বিতৃষ্ণা আমি সহ্য করিতে পারিব না, সেই জন্য ফুলের কথা ত্যাগ করি-

লাম। তুমি সূর্য্যালোক কেমন ভাল বাস? এখানে সূর্য্যকিরণে আলোক আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই, গণিত শাস্ত্রের ভাষায় এখানকার সূর্য্যকিরণ আলোকময় —বাদ উত্তাপ; সেই জন্য এত মধুর; আমাদের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের সতাপ সূর্য্যকিরণ মনে করিলে ইহা মধুর হইতে মধুরতর হয়। আবার ঠিক এই সময়েই দিবাভাগের সমধিক বৃদ্ধি। রাত্রি চার পাঁচ ঘণ্টা মাত্র; বাকী সমস্ত টাই দিন; ২॥ কি ৩ টার সময় ভোর হইয়া বেশ আলো হয় এবং রাত্রি ১০ টার সময় পর্য্যন্ত বেশ আলো থাকে। অপরাহ্নে ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গোধূলী। রাত্রি নাই বলিলেও ক্ষতি নাই; মনে করো না, ইহাতে নিদ্রার কোন প্রতি-বন্ধক হয়।

রেডিং নগরের কৃষি-মেলা।

ভাই! আমাদের দেশের কৃষি-প্রদর্শনী দেখি-য়াছি এবং এখানকার প্রদর্শনীও দেখিলাম। তুলনা করা দূরে থাকুক একস্থানে উভয়ের উল্লেখ করি-তেও লজ্জা বোধ হয়। রয়েল এগ্রিকল্‌চারল্‌

নামক সমিতির চেষ্টায় এখানে একটী করিয়া কৃষিপ্রদর্শনী হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এক স্থানে এই সমবেত হয় না, সভ্যদের মত লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান এই জন্য মনোনীত হয়। রেডিং প্রদর্শনী জনসাধারণের জন্য তিন দিন খোলা ছিল। প্রথম দিন ১॥০ টাকা, দ্বিতীয় দিন ৪॥০ টাকা, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন ১॥০ টাকা ও শেষ দুই দিন ॥০ আনা করিয়া দর্শনী স্থির হইয়াছিল। একটা প্রকাণ্ড মাঠ এই জন্য কাঠের প্রাচীর দিয়া ঘেরা হইয়াছিল। তত্রাচ লোকের খুব ভীড়। প্রধান কথা প্রদর্শনীতে কি কি দেখিলাম? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা কৃষিপ্রদর্শনী, অতএব তৎসম্বন্ধীয় প্রায় সকল দ্রব্যই দেখা গেল। প্রথম, কৃষি-কার্য্যোপযোগী যন্ত্র; দ্বিতীয়, কৃষিকার্য্যোপযোগী অথবা আহারোপযোগী জন্তু, যথা—ভেড়া, গরু, ঘোড়া ও শূকর; তৃতীয় নানাপ্রকার সার, বীজ ও ফল; চতুর্থ মাখন ও পনীর; পঞ্চম মাখন প্রস্তুত করার নিয়ম প্রদর্শন; ও ষষ্ঠ মধু ও মোমের চাষ।

প্রথম, যন্ত্র,—এখানে চাষের যন্ত্র সকল ঘোড়া অথবা বাষ্পীয় কল দ্বারা চালিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন

চাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র। মাটী সম্পূর্ণরূপে উল্‌টাইবার জন্য প্লাউ ব্যবহার হয়; প্লাউ কতকটা লাঙ্গলের মত, অথচ আমাদের লাঙ্গলকে সম্পূর্ণরূপে প্লাউ বলা যাইতে পারে না, কারণ আমাদের লাঙ্গল দ্বারা মাটী উল্‌টান হয় না বলিলেই হয়। প্লাউ কার্য্য-পদ্ধতি একই প্রকার; কিন্তু মূল্য ও সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া নানাপ্রকার প্লাউ এখানে চাসের জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু এই সকল প্লাউ আমাদের দেশের অনুপযুক্ত, মূল্য ৩০।৪০৲ টাকার কম নহে, এবং এত ভারী যে ঘোড়া ভিন্ন চলে না। এক দল ব্যবসাদার ভারতবর্ষের জন্য হালকা কমদামী প্লাউ প্রস্তুত করিয়াছেন দেখিলাম। তাহাদের লোক যত্ন করিয়া আমাদিগকে সেই সকল দেখাইলেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। শুনিলাম বোম্বের দুই জন পারসী প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া দুই তিনটী ফরমাস দিয়া গিয়াছেন। আর এক প্রকার দেখিলাম যাহা আমাদের দেশে চলিত হওয়া বড় আবশ্যক। আলুর "ভেলী" বাঁধিবার জন্য আমাদের কোন যন্ত্র না থাকাতে কত লোকের ও সম-

য়ের আবশ্যক হয়; কিন্তু এক রকম প্লাউ আছে, যদ্দ্বারা আপনা হইতেই ভেলী বাঁধা হইয়া যায়। যে সওদাগর দলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা আমাদের দেশের জন্য হালকা করিয়া এই প্রকার প্লাউ প্রস্তুত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘাসের চাপড়া কাটিবার লাঙ্গল, আলু তুলিবার লাঙ্গল, মাটী না উল্টাইয়া কেবল কর্ষণ করিবার লাঙ্গল (Cultivator)—এই রূপ নানা প্রকার লাঙ্গল প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। ভূমিতে লাঙ্গল দিবার পর ঢেলামাটি গুঁড়াইবার জন্য আমাদের দেশে "মই" ব্যবহার করে, সেই জন্য নানা প্রকার যন্ত্র আছে। আল্গা মাটীতে গোধূম ইত্যাদি ভাল হয় না। সেই জন্য দুই তিন রকম রুল (Roll er) দ্বারা সেই সকল ভূমির মাটীতে চাপ দেওয়া হয়। তৎপরে বীজ বোনার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র; কোন যন্ত্র দ্বারা সার বাঁধিয়া, কোন যন্ত্র দ্বারা এলো মেলো ভাবে বীজ বোনা হয়, কোন বীজ সারের সহিত, কোন বীজ বিনা সারে বোনা হয়, এই সমস্ত কার্য্য যন্ত্র দ্বারা হইয়া থাকে। গম ইত্যাদি কাটিবার সময় হইলে শস্য কাটা,

আটি বাঁধা, আছড়ান ও অবশেষে পালুয়ের উপর খড় তোলা পর্য্যন্ত যন্ত্র দ্বারা হয়। গম ইত্যাদি পাছড়ান, আগড়া বাছা ইত্যাদি সবই যন্ত্র দ্বারা, এবং এই সকল যন্ত্র ও সমস্ত কার্য্য-প্রণালী মেলায় দেখান হইয়াছিল। গরু বাছুরের জন্য খড় কাটিতে হইবে তাহাও কলে, এক ইঞ্চের চতুর্থাংশ হইতে আধ হাত তিন পোয়া পর্য্যন্ত ইহাতে কাটা যায়; এই রকম একটা ছোট জাবকাটা কলের দাম ২৫।৩০৲ টাকা। এদেশে খড়, গরু ঘোড়া ইত্যাদির খাবার জন্য বড় ব্যবহার হয় না, এবং ভেড়াকেও দেওয়া হয় না। খড় প্রধানত এই সকল জন্তুর শুইবার বিছানার জন্য ব্যবহার হয়। গ্রীষ্মকালে গরু বাছুরকে ঘাস খাইতে ঘাসের জমীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কিন্তু শীতের সময় তাহারা বাহিরে যাইতে পারে না, সেই জন্য একরকম ঘাস (Hay) প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া রাখা হয়। জুন জুলাই মাসে এই ঘাস কাটা ও শুকান হয়, কিন্তু শুকনের সময় বৃষ্টি হইলে কৃষকদের মহা বিপদ, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রমাগত কয়েক বৎসর হইল এই সময়ে খুব বৃষ্টি

হইতেছে ; বৃষ্টির হাত হইতে এড়াইবার জন্য এক রকম কল প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা বৃষ্টি হইলেও শুকাইবার কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই ; কাঁচা ঘাসের পালুই দিয়া সেই কল দ্বারা ঘাস শুকান হয়। জমীর "নিড়ান" জন্য আমাদের দেশে কত লোক ও সময় আবশ্যক, অনেক স্থলে সময়ের ও লোকের অভাবে জমী নিড়ান না হওয়ায় কৃষকদের কত ক্ষতি হয় ; কিন্তু এদেশে নিড়ান জন্য যে নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবহার হয়, তাহাও এই প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। এক প্রকার নিড়ান যন্ত্র সকল প্রকার জমীর উপযুক্ত কখন হইতে পারে না ; গমের নিড়ান যন্ত্র,—মুলার নিড়ান যন্ত্র বা আলুর নিড়ান যন্ত্র হইতে অবশ্য ভিন্ন ; জমীর ঘাস মারিবার জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্র। এইরূপ যে সকল যন্ত্র কৃষিকার্য্যের জন্য এদেশে ব্যবহার হয় ও রেডিং-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা দেওয়া বা বর্ণনা করিবার আবশ্যক তত দেখি না।

বিলাতী-গাভী।

১৭ই আগষ্ট, ১৮৮২।

ভাই! একে বিলাতে আসিয়াছি, তার উপর আবার বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লিখিতেছি,—বোধ হয় এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আবার পাপের উপর পাপ—ত্রিপাপ উপস্থিত; কোথায় দুটা রসের কথা লিখিয়া, মেয়ে মানুষের কথা লিখিয়া পাঠকের মন ভুলাইব, তা নয়, কেবল চাসবাসের কর্কশ কথা বলে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছি; আমার অদৃষ্ট মন্দ, বিলাত আসার ফল ফলিল না, সাহেব হইতে পারিলাম না!

পূর্ব্ব পত্রে কৃষি-উপযোগী নানারূপ যন্ত্রের কথা লিখিয়াছি। যন্ত্রহীন, কলকৌশলহীন, বাঙ্গালীর ওসব ভাল না লাগিতে পারে। এবার খাওয়া দাওয়ার দুটা কথা বলি। আমাদের প্রধান খাদ্য,—চাল, গম, ছোলা, মটর, শাকশবজি; কিন্তু ইংরেজের প্রধান খাদ্য,—মাংস, মাখন,

পনীর। কাজেকাজেই এখানকার কৃষিকার্য্যের প্রধান যত্ন, মাংস প্রস্তুত করা; অতএব রেডিং নগরের কৃষিমেলায় যে, নানা জাতীয় ভেড়া, শূকর, গরু ইত্যাদি প্রদর্শিত হইবে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পার। এই সকল গৃহপালিত পশুর আকার ও শ্রী দেখিয়া বেশ বুঝিলাম, কেমন যত্নের সহিত তাহারা পালিত হয়। কিবা নধর গঠন, যেন গায়ে ঠোস্ মারিলে রক্ত পড়ে। সেই সময় আমাদের দেশের গরু বাছুরের দুর্গতি ও অযত্নের কথা মনে হইল। আমাদের দেশের অনেকানেক গৃহস্থ একপাল করিয়া গোরু রাখেন; ভাল খাইতে দিতে পারেন না; যে গাভাটী নবপ্রসব করিল, তাহারই সেই সময়ের জন্য চার্‌টী চার্‌টী খোল ভূষির বরাদ্দ হইল,—অবশিষ্ট গুলি যে গোরু, সেই গরুই রহিল,—ঠেলিলে পড়িয়া যায়, চক্ষুকোণে জলধারার রেখা,—গোশালা এক একটী ক্ষুদ্র নরকবৎ, দুর্গন্ধময়, গভীর কর্দ্দমবিশিষ্ট—সুগন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া পড়ে, কাহার সাধ্য সে বিভীষিকাময়ী ভয়ঙ্করমূর্ত্তি গোশালার নিকট যায়? কিন্তু এখানকার পশুশালা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সিন্দূরটী পড়িলেও কুড়াইয়া লওয়া যায়, দুদণ্ড দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। এখানে যেমন যত্ন, ফলও তদ্রূপ। এখানকার এক একটা গাভী দিনে দুইবারে অর্দ্ধমন বা ত্রিশসের পর্য্যন্ত দুধ দিয়া থাকে; আমাদের দেশের গোরু যেরূপ দুরবস্থায় থাকিয়াও দুগ্ধ দেয়, সমধিক যত্ন ও আহার পাইলে, আমার বিশ্বাস, আমাদের গোরুও বিলাতের গাভীর ন্যায় দুগ্ধবতী হইতে পারে। মহাভারতে পড়িয়াছি, সেকালে ভারতবাসীর গাভীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল;—গাভী ষড়-ঐশ্বর্য্যশালিনা ভগবতী। প্রাচীন হিন্দুগণ গাভাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। গাভী গৃহস্থের অমৃতক্ষারিণী, মঙ্গলকারিণী, চতুর্বর্গফলদাত্রী ছিল,—কিন্তু এক্ষণে আমাদের দেশের গৃহস্থের গাভা, নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িয়াছে। যদ্রূপ ভক্তি, ফলও তদ্রূপ;—গাভী দুগ্ধ হরণ করিয়াছেন। অযত্নে থাকিয়া সুরভি দুগ্ধ দিবেন কেন? যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

ভাই! বিলাতের এক একটা গাভার ও বলদের মূল্য শুনিলে, আশ্চর্য্য হইবে। সচরাচর

দুই হাজার বা তিন হাজার টাকায় এক একটা বলদ বা গাভী বিক্রয় হয়। দশ হাজার পনের হাজার টাকা মূল্যেরও গরু আছে। অবিশ্বাস করিও না, সে দিন একজন আমেরিকাবাসী তাঁহার গাভীর পাল ভাল করিবার জন্য একটা বলদ এক লক্ষ টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন। এরূপ মূল্যে বলদ বিক্রী প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

ভুঁড়িওয়ালা বনিয়াদী বাঙ্গালী বাবুর ন্যায় বাটী বাটী ঘনাবর্ত্ত দুধ খাওয়া এখানকার অনেক লোকের অভ্যাস নাই; কিন্তু মাখন ও পনীর প্রায় সকলেই খাইয়া থাকেন। মাখন ও পনীর প্রস্তুত করা কৃষিকার্য্যের এক স্বতন্ত্র শাখা। এমন অনেক কৃষক আছেন, যাঁহারা কেবল মাখন ও পনীরের চাস করেন। মাখনের চাস বলিলাম বলিয়া আশ্চর্য্য হইও না, কারণ এখানে সচরাচর "ভেড়ার-ফসল" (Crop of Sheep) শূকরের-ফসল (Crop of Pigs) ইত্যাদি পদের ব্যবহার হয়। সে যাহোক, ঐ কৃষকেরা সকল জমীতেই গরু বাছুরের আহারোপযোগী কেবল ঘাস ইত্যাদির চাস করিয়া থাকেন। এই সকল কৃষকের হয়ত প্রতিদিন

১০০ মণ কি ১৫০ মণ দুধ হয়; সেই সমস্ত দুগ্ধ হইতে যন্ত্র দ্বারা পনীর অথবা মাখন প্রস্তুত হয়। মেলা স্থলে যন্ত্রের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী বুঝাইবার জন্য যন্ত্রাধিকারীদের লোক সমধিক ভদ্রতা ও যত্নের সহিত সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন; আমরা বিদেশী আমাদের প্রতি বিশেষ ভদ্রতা ও লক্ষ্য দেখিলাম। ভেড়া ও শূকর পালন সম্বন্ধেও এইরূপ যত্ন। এখানে চাসের কার্য্য একেবারে নিরক্ষর লোকের হাতে অর্পিত নহে। বেশী কথা না লিখিয়া ইহা লিখিলেই যথেষ্ট যে, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স (যুবরাজ) এবং স্বয়ং মহারাণীর গাভী ইত্যাদির চাস আছে; এবং সেই সকল গাভী ও ভেড়া প্রায় সকল মেলায় প্রদর্শিত হয়। এবারে রেডিংএ যুবরাজের ভেড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং পুরস্কারও পাইয়াছিল, কিন্তু প্রধান রাখালের মৃত্যু বা অসুখ (ঠিক মনে নাই) বশত মহারাণীর গরু ইত্যাদি প্রদর্শিত হয় নাই। যখন প্রদর্শনী সাধারণের জন্য খোলা হয়, তখন একদিন যুবরাজ তথায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। আমি সেই দিন সেখানে ছিলাম। দেখিলাম তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের কি

আগ্রহ। আগ্রহটা স্ত্রীলোকদের কিছু বেশী দেখিলাম। যুবরাজ প্রায় সকল পশুশালায় এক একবার পদার্পণ করিলেন, এবং যে সকল গাভী অশ্ব ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার পাইয়াছে, তাহাদিগকে যত্ন করিয়া দেখিলেন। তাঁহার কোন পশুই প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার পায় নাই। ৩।৪ ঘণ্টা থাকিয়া যুবরাজ চলিয়া গেলেন।

কৃষিকার্য্যের প্রতি লোকের কি সমধিক দৃষ্টি! আজ কাল একটী নূতন রকম চাসের উদ্ভব ও অল্প দিনের মধ্যে তাহার বেশ উন্নতি হইয়াছে; মৌমাছি পুষিয়া তাহাদের দ্বারা মধু প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। সেই জন্য নানা প্রকার যন্ত্র ও কৌশল আবশ্যক। এই সকল যন্ত্র, কৌশল, মৌমাছি, মধু প্রস্তুত পদ্ধতি সমস্ত প্রদর্শনীতে দেখান হয় ও তৎসম্বন্ধে একজন মধুচাস-ব্যবসায়ী বক্তৃতা দেন।

রেডিং কৃষিমেলায় বহুসংখ্যক রমণীকুলের সমাগম হইয়াছিল। পুরুষ-জঙ্গলের মাঝে যেন প্রস্ফুটিত কমলরাশির প্রকাশ। অনেক রমণী হাস্যময়ী, স্বেচ্ছাভ্রমণকারিণী, কেবল নয়ন পরিতৃপ্তির

জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ দেখিলাম, অতি যত্নের সহিত, প্রদর্শিনীর অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেছেন। একজন মান্য-গণ্য কৃষকের সহিত আমার আলাপ ছিল; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! কৃষিপ্রদ-র্শিনীতে এত স্ত্রীলোক কেন?" তিনি একটু রসি-কতার সহিত উত্তর করিলেন, "অবশ্য কোন কোন রমণী কিছু কিছু বোঝেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আগমন এ কৃষিমেলার মঙ্গলের জন্য—যদি তাঁহারা এখানে পায়ের ধূলা না দিতেন, তাহা হইলে এই মেলার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য, গরিমা ও আকর্ষণশক্তি নষ্ট হইত।" ইতি মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কিউ-বাগান।

২২শে আগষ্ট।

কিউগার্ডেন নামক একটা স্থানে আমি কিছু দিন ছিলাম। কলিকাতার নিকট শিবপুরে যেমন

একটা কোম্পানির বাগান আছে, সেইরূপ কিউ-গার্ডেনে একটা প্রকাণ্ড বাগান আছে। বাগানটি ঠিক টেম্‌স্ নদীর উপরেই, লণ্ডন হইতে প্রায় ২০ মাইল। কেবল উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্যই বাগানটি করা হয় নাই; ইহা লণ্ডন ও পার্শ্ববর্ত্তী নগরের লোকের একটি প্রধান আমোদের স্থান। এই সকল নগর হইতে প্রত্যহ শত সহস্র লোক বাগান দেখিতে ও বেড়াইতে আইসেন। আসিবার যান নানা প্রকার। রেলগাড়ী, ঘোড়ারগাড়ী (Bus) ও ইষ্টিমার—ঘণ্টায় ঘণ্টায় শত শত লোক আনিতেছে ও লইয়া যাইতে। ইষ্টিমারে যাতায়াত সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা, কাজেকাজেই অধিকাংশ লোকই ইষ্টিমারে আইসে। প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাগান সাধারণের জন্য খোলা থাকে। রবিবার দিন (বোধ হয় তুমি জান) এখানে দোকানদানি, সাধারণ স্থান, থিয়েটার, অপেরা ইত্যাদি আমোদ আহ্লাদের স্থান সমস্তই বন্ধ থাকে, কিন্তু কিউএর বাগান লোকের সুবিধার জন্য রবিবারও খোলা, তবে সে দিন বেলা ২টা হইতে খোলা হয়। রবিবার দিন কিছু

বেশী লোকের গতায়াত, কারণ সে দিন সকলেই অবকাশ পায়। বৎসরের মধ্যে কেবল বড় দিনের দিন বন্ধ হয়, কিন্তু যে যে দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকে সেই সেই দিন বেলা ১০ হইতে খোলা হয়। এইরূপ সুখদর্শন ও আমোদের সাধারণ স্থান সকল, যাহাতে রবিবার দিনও খোলা থাকে, তৎসম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আন্দোলন আজকাল প্রায়ই হইয়া থাকে এবং যদিও সেই আইন এখনও পাশ হয় নাই, শীঘ্র হইবার খুব সম্ভাবনা। অনেক লোকই রবিবার দিন অবসর পান, তাঁহাদের জন্যই এই আন্দোলন।

বাগানের আয়তন প্রায় ৫০০ শত বিঘা। ইহার অর্দ্ধেকটা আন্দাজ স্থান বিজ্ঞান জন্য বিশেষ-রূপে নির্দ্দিষ্ট ও বাকি অর্দ্ধেকটা প্রায় কেবল বড় বড় গাছে পরিপূর্ণ। সমস্ত বাগানটী অতি সুন্দর-রূপে রাখা হইয়াছে, রাস্তাগুলি অতি পরিষ্কার, কোথাও একটী কুটিকাটী বা কোন প্রকার ময়লা দেখিবার যো নাই। রাস্তা ছাড়িয়া ঘাসের উপর বেড়াইতে নিষেধ নাই। ঘাসগুলিও এত সুন্দর ও পরিষ্কার যে তাহার উপর শুইয়া থাকিতে

ইচ্ছা হয়। যাঁহারা বাগান দেখিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেঞ্চে না বসিয়া দিব্য চৌদ্দপোয়া হইয়া ঘাসের উপর শুইয়া থাকেন। বাগানে প্রবেশ জন্য চারিটী ফটক, দুইটী নদীর দিকে ও দুইটী সহরের দিকে। সর্ব্বপ্রধান ফটকটীর নাম রাজকীয় ফটক।

বাগানের যে অর্দ্ধেকটা বিজ্ঞানের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই অংশটিই বিশেষ সুন্দর। এই অংশের মধ্যে দেখিবার প্রধান জিনিষ, আটটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্লাসের ঘর। গ্লাসের ঘরের কি আবশ্যক অবশ্য জান। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলীয়া, নিউজিলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি গরম দেশের গাছপালা এখানকার শীত সহ্য করিতে পারে না। তাহাদিগকে সেই জন্য গ্লাসের ঘরে কৃত্রিম উত্তাপে রাখা হয়, যেন নিজ নিজ দেশেই তাহারা রহিয়াছে। এত তত্ত্বাবধারণ ও যত্ন যে, ভিন্ন দেশে কৃত্রিম অবস্থায় থাকিয়াও, তাহাদের বৃদ্ধির কোন হ্রাস হইয়াছে, তাহা বোধ হইল না। যে গাছ যেমন গরম ও জল বায়ু সহ্য করিতে পারে, তাহাকে সেই অনুসারে ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ঘরে লইয়া রাখা হয়।

তাল নারিকেল খেজুর প্রভৃতি যে ঘরে, সেই ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু ও বড়। ঘরের মধ্যে তাল গাছ রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে করিও না যে, ইহা খর্ব্ব আধমরা জীর্ণ,—নামে মাত্র তাল গাছ। দেশে যে বড় বড় মোটা তাল গাছ দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত তুলনা করিলে ইহারা যে কোন অংশে নিকৃষ্ট তাহা আমার বোধ হইল না। খেজুর নারিকেল প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহা ব্যতীত আরও কত জাতীয় তাল, খেজুর, নারিকেল ও সাগু গাছ দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। এই ঘরে উত্তাপ এত বেশী যে, বাহির হইতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলাম। হঠাৎ পরিবর্ত্তনের দরুন এত অধিক গরম বোধ হয়, বাস্তবিক তত গরম নহে।

তাল গাছের ঘর ছাড়িয়া একটা ছোট ঘরে কেবল নানা জাতীয় পদ্ম ও জলের গাছ; নানা-প্রকার পদ্ম শালুক প্রভৃতি ফুটিয়া রহিয়াছে। পদ্ম ও শালুক দেখে বোধ হয়, যেন আমাদের দেশের একটা এঁদো পুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পদ্মের ঘর ছাড়িয়া একটা নানা জাতীয় ফুলের ঘরে ঢুকিতে হয়। এই ঘরের তিনটা ভাগ, মধ্য-স্থলে একটা ঘর ও তাহার তিন পাশে তিনটা ঘর। মধ্যের ঘরে একটা পুকুর ; সেই পুকুরে "ভিক্টোরিয়া রিজিয়া" বলে এক রকম আমেরিকা দেশীয় পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এমন পদ্মপাতা কখন পূর্ব্বে দেখি নাই, মাজামাজি মাপিলে ৪ হাতের কম হইবে না। এক জন লোক বেশ তাহার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইতে পারে। এই পুকুরের ধারে একটা কলাগাছে সুন্দর এক কাঁদি কলা (মায় মোচা) হইয়া রহিয়াছে। বিদেশে —যেখানে মানুষ নূতন, জীব জন্তু নূতন, গাছ পর্য্যন্ত নূতন, দেশীয় জিনিষের মুখটা দেখিবার যো নাই, সেখানে যত সামান্য হউক না কেন, স্বদেশের একটা জিনিষ দেখিলে মনে একটা অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ হওয়া কি স্বাভাবিক নয় ? এই ঘর-টীর এক দিকে নানা জাতীয় মানুষের ব্যবহার্য্য উদ্ভিদ্‌, আর এক দিকে নানা জাতীয় " অর্কিড " ও কীটভোজী উদ্ভিদ্‌, ও তৃতীয় দিকে নানা জাতীয় সুন্দর ফুলের একত্র সমাবেশ।

কিউ-বাগান।

৮ই সেপ্টেম্বর।

গতবারে বিলাতের সেই সর্ব্বজনমনোহর বাগা কথা বলিতে বলিতে রাখিয়া দিয়াছি। এবার আরও কিছু বলিব। সেই উদ্যানমধ্যস্থ তিন রকম কাচের ঘরের বিষয় পূর্ব্বপত্রে উল্লেখ করিয়াছি; আরও পাঁচটী সেইরূপ গ্লাসের ঘর আছে। ঐ ঘরগুলি নানাদেশীয় নানাজাতীয় গাছগাছড়ায়, লতা পাতায় পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে একটী ঘরের নাম প্রমোদকানন (Pleasure Garden),—এ ঘরটি নির্দ্দিষ্ট অংশের মধ্যে নহে, অপরস্থানে অবস্থিত। কাচের ঘর ব্যতীত আরও দেখিবার সুন্দর জিনিস আছে—তিনটী যাদুঘর (Museum)। কি উদ্দেশে এই তিনটী ঘর এরূপ সুপরিপাটী সুন্দর ভাবে সুরক্ষিত?—নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে মনুষ্যের ব্যবহার্য্য কি কি দ্রব্য পাওয়া যায় ও প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা দেখানই ঐ যাদুঘরগুলির

প্রধান উদ্দেশ্য। মনে কর, নারিকেল গাছ, ফল, ও পাতা হইতে কোন্ কোন্ দেশে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সব দ্রব্যের নমুনাই এখানে দেখিতে পাইবে। গুঁড়ি হইতে কড়ী, পাতা হইতে ঝাঁটা, পরদা, বিছানা, গদি. ছাতি ইত্যাদি; ফল হইতে হুঁকা, বাটী, চা খাইবার পিয়ালা, শাঁস হইতে তৈল হয়, তাহা পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে। সকল প্রকার উদ্ভিদই এই রকম ঘরে দেখিলাম। গুঁড়ি কত বড় হইতে পারে, তাহার নমুনা আছে; যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাহার ব্যাস সাড়ে ছয় হাত।

উদ্যানের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশে ছাত্রদের পড়িবার সুবিধার জন্য কতকগুলি গাছগাছড়া, জাতি ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া রাখা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের এ সকল স্পর্শ করা নিষেধ; স্পর্শ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আর একটী স্বতন্ত্র অংশ আছে,—এই স্বতন্ত্র অংশের নাম "ছাত্রদের বাগান"; এটী নিতান্ত নাবালকদের জন্য; যেন খেলা-ঘরের বাগান। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ শিখিবার আশায় এখানে আসা ভ্রম মাত্র; শিখিবার কোন বন্দবস্ত বা সুবিধা নাই। পূর্ব্ব হইতে

উদ্ভিদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা থাকিলে অনেক দেখিবার ও শিখিবার আছে—তবে খুঁজিয়া লওয়া চাই। তোমার আমার মত লোকের কেবল চক্ষু তৃপ্তি। কিন্তু এরূপ কেবল চোখের দেখা দেখায় যে কোন ফল নাই, তাহা বলিতেছি না —ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যহ শত শত রমণী ও পুরুষ চক্ষু পরিতৃপ্তির জন্য, হৃদয়মন রঞ্জন করিবার জন্য বাগানে যাতায়াত করেন; এইরূপ আসিতে আসিতে ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখিয়া যান। দেখিবে, কোথাও উদ্যানমধ্যে নবীনা প্রবীণা রমণীরা একত্র হইয়া দল বাঁধিয়া ফুল, ফল, গাছ, পাতা সম্বন্ধে কেমন গল্প করিতেছেন; কোন বহুদর্শিনী বৃদ্ধা বলিতেছেন, অমুক ফুলটা অমুক শ্রেণী, অমুক ফুলটা অমুক জাতি; বৃদ্ধার কথায় প্রতিবাদ করিয়া কোন এক শিক্ষিতা গর্ব্বিতা, সাজসজ্জায় সজ্জিতা যুবতী মহিলা অমনি বলিয়া উঠিলেন,—না, তা নয়, আপনি জানেন না, —আমি সে দিন অমুক কলেজের অমুক অধ্যাপকের সহিত এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম,

তিনি আমাকে বলিয়াছেন, ওটা অমুক জাতি।” এখানে এরূপ দৃশ্যের অভাব নাই। আমরা কয়েক-জন বন্ধু মিলিয়া একদিন একটা গাছের নিকট দাঁড়াইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছি “এটা কি গাছ” ? এমন সময় একটী বুড়ি বিবি সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গিনী সহচরীকে বলিলেন—“জান, এটা কি গাছ ? এটা ক্লিমেটিজ—Clematis, Natural Order Rannunculaceæ” আমরাত শুনিয়া অবাক্‌ !

বিলাতের রাজধানী লণ্ডন নগরে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে খোষগল্প ও আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণে লোক-শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মন প্রশস্ত করিবার জন্য, চক্ষু ফুটাইবার জন্য এমন সহজ উপায় খুব কমই আছে। যিনি একবার সাউথ-কেনিংষ্টনের যাদুঘরটী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর চারি দিক ভ্রমণ না করিয়াও সকল দেশের যাবতীয় আদর্শ-দ্রব্য দেখিয়াছেন বলিয়া গৌরব করিতে পারেন। ব্রিটিশ যাদুঘরে পেপাইরস (Papyrus) কাগজে

চিত্রে দ্বারা লেখা, তুলার কাগজে হাতে লেখা, তালপত্রে খন্তী-লেখা ও আজকালকার তাড়িৎ দ্বারা ছাপার লেখা পুস্তক, স্তূপ স্তূপ দেখিবে ;— দেখিলে মন কেমন অভাবনায় আনন্দে পূর্ণ হয়— যাহার কখনও মা সরস্বতীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহারও মন খুলিয়া দেবী পূজায় ভক্তি জন্মে। যে সকল লোক—বিশেষত যে সকল বরফনিভ ধবলকান্তি, ধন-যৌবন-বিদ্যা-পোষাক-গর্ব্বিনী বিলাতী রমণী অপাঙ্গ দৃষ্টিতে জগতের সত্ত্বসারকেও যেন তৃণবৎ মনে করিয়া অভিমান-ভরে ভাবেন যে, এই ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্য জাতি মাত্রেরই তাঁহাদের ন্যায় পোষাক, তাঁহাদের ন্যায় আহার, তাঁহাদের ন্যায় ধরণ ধারণ, এবং তাঁহাদের ন্যায় ভাষা অবশ্যই হইবে ; ভিন্ন দেশে মনুষ্য ভিন্নরূপ হয় দেখিয়া যাঁহারা অধরের হাসি লুকাইতে পারেন না, এবং যাঁহারা ভিন্ন দেশের লোককে ভিন্ন প্রকার পোষাক পরিতে দেখিলে বিস্মিত হইয়া বলেন—" how funny it is ! কি মজা, এদের চেহারা দেখ—এরা আমাদের মত ইংরাজী কথা কহে না, আমাদের মত কাপড় পরে না—আপনা-

পনি হিলি বিলি করিয়া কি আবার বকে,”—সেই সকল ক্ষুদ্রহৃদয়া রমণীর “পদার্থ-ইতিহাস-যাদু-ঘরের” শত শত ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্তু ও উদ্ভিদ্ দেখিয়া ক্ষুদ্র মন যে প্রশস্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ছবির ঘরটী বড় সুন্দর।—প্রেমিকের হাস্যময় ঢল ঢল মূর্ত্তি, হতাশের আক্ষেপময় বিশুষ্ক মূর্ত্তি; ঘাতকের বিকট মূর্ত্তি; আহতের ম্লানময় নিস্তেজ মূর্ত্তি; ক্রোধান্ধ ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য বিকম্পিত দেহ, ক্ষমাশীলের চারু সৌম্য কান্তি, বালক বালিকার কোমল কমনীয় দেহ—এ সকলি তোমার নয়ন পথের পথিক হইবে। ঘটনাবলীরও নানারূপ চিত্র দেখিতে পাইবে; কোথাও নৃশংস বিকট সংগ্রাম হইতেছে, নিয়ম নাই ক্ষমা নাই—যে যাহাকে বলে পরিতেছে, সে তাহাকে হত্যা করিতেছে;—কোথাও শান্তি-ময় স্নেহময় পরিবারবর্গ; কোথাও আনন্দময় সুখের বিলাস মন্দির,—তাহার পার্শ্বেই আবার দুর্ভর শোকময় মৃত্যু-শয্যা। স্বভাবের কেমন মনোহর দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে;—নিবিড় অরণ্য,

সুন্দর নদীর তীর, মনোরম হ্রদ, ভীষণ ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ তরঙ্গময় সমুদ্র বক্ষ;—এই সকল দেখিয়া কাহার না সুপ্ত ইন্দ্রিয়ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়! আবার স্ফটিক নির্ম্মিত গৃহে যখন বৈদ্যুতিক আলো দেখিবে, তখন তোমার মন একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িবে। লণ্ডনে এইরূপ আমোদের সহিত শিক্ষার স্থান আরও অনেক আছে। ইহাতে জনসাধারণের যে কত উপকার হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিও। বাগানের কথা বলিতে বলিতে অনেক-দূর আসিয়া পড়িয়াছি; বাগান সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। ভাই! স্ত্রীলোকের অধ্য-বসায়, আগ্রহ ও কার্য্যকুশলতা যে কতদূর তাহা দেখ; মিস্ নর্থ নামক একটী বিলাতের স্ত্রীলোক পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া সেই সেই দেশের প্রধান গাছ গাছড়া ও ফল ফুলের ছবি (Oil painting) স্বহস্তে আঁকিয়া আনিয়া এই বাগানে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দান করিয়াছেন। একটী প্রকাণ্ড হলের প্রাচীরে সমস্ত ছবিগুলি সুন্দররূপে বসান হইয়াছে। ছবি-গুলি এত ঠিক্ যে, যেন ঠিক্ সেই জিনিসটী।

এ কটী ছবিতে কলার কাঁদি চিত্রিত দেখিলাম, প্রথম দেখিবা মাত্র সত্য সত্যই কলার কাঁদি বলিয়া ভ্রম হয়। একবার ভাবিয়া দেখ—একটী স্ত্রীলোক কতদূর করিতে পারে? যে দেশের স্ত্রীলোকের এতদূর অধ্যবসায় ও গুণপণা, সে দেশের সন্তানগণ কেন না বীর্য্যবান, যশোবান ও গুণবান হইবে?

রান্নাঘর।

মধ্যে মধ্যে মুখ বদলান আবশ্যক। তাই আজকার আহারটা একটুকু বদলাইয়া দিলাম। ডাল, ভাত, শাক, পাতা খাওয়াটা ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস। ইহাকে ভাল অভ্যাসই বল, আর কু অভ্যাসই বল, দুমাস ছমাস বা দুই এক বৎসরের মধ্যে তাহা একেবারে ত্যাগ করা সহজ নহে। হাজারই কেন ঘৃণা করি না, তথাচ মুগের ডাল মাছের ঝোল, কলাইএর ডাল, মাছের অম্বল, শাকচচ্চড়ি, মোচার ঘণ্ট খাইতে এক একবার বড়

ইচ্ছা হয়। আশা করি, সভ্যতার সহিত ক্রমে শাকচচ্চড়ি ভুলিব, কলাইয়ের ডালের নাম শুনিলে ঘৃণা হইবে, কিন্তু এখনও সে বদ অভ্যাস ভুলিতে পারি নাই, এখনও এক একবার খাইতে ইচ্ছা হয়। একবার ছুটী উপলক্ষে আমরা দেশীয় দুই তিন জন একত্রে হইয়াছিলাম। আমি প্রস্তাব করিলাম, "এস একদিন নিজে রন্ধন করিয়া দেশী রকমের খাওয়া যাউক।" শুনিবা মাত্র সকলেরই মত হইল। শনিবার সন্ধ্যার সময় এই কথা হইল; রবিবার দিন রাঁধিতে হইবে। কিন্তু রবিবার দিন বাজার, হাট, দোকানদানি সব বন্ধ, কোন জিনিষ পাইবার যো নাই। যাহা যাহা আবশ্যক ফর্দ্দ করিয়া গৃহকর্ত্রীকে (Land Lady) দেওয়া গেল, তিনি সেই দিনই কিনিয়া রাখিবেন বলিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার সহিত গৃহকর্ত্রীকে বলা গেল যে, আমরা তাঁহার রান্না ঘরে রাঁধিতে গেলে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে কি না। তাঁহার অসুবিধা হইলেও তিনি অমত করিতে পারিবেন না পূর্ব্বেই জানিতাম, তবে সভ্যতার খাতিরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র। যখন

তিনি মত দিলেন, তখনও সেই সভ্যতার খাতিরে তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া গেল। বিলাতে এসে আর কিছু হউক আর না হউক, ধন্যবাদ দেওয়াটা খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। দেশে থাকিতে কার্য্যোপলক্ষে যখন সাহেব শুভোদের সহিত দেখা করিতে যাইতে হইত, তখন পূর্ব্ব হইতে মনে করিয়া যাইতাম যে, কথায় কথায় ধন্যবাদ দিতে হইবে, কারণ, শুনিয়াছিলাম ইহাই সাহেবী কেতা! কিন্তু কি বিড়ম্বনা! দর্শন-মন্দিরে উপস্থিত হইবা মাত্র শ্বেত-মুখ দেখিয়াই হউক, আর যাহাতেই হউক, পূর্ব্ব কল্পিত ধন্যবাদ-বর্ষণ একেবারে ভুলিয়া যাইতাম। দর্শন-মন্দির হইতে বাহিরে আসিলে সে জ্ঞান হইত, কিন্তু তখন আর উপায় কি আছে? এখন কিন্তু আর সেটি বলিবার যো নাই। যদিই ভুল হয় সে অন্য দিকে, তাহাতে দোষ নাই। এ কথা যাউক। রবিবারদিন আমরা ত্রিমূর্ত্তি রন্ধনশালায় উপস্থিত, আমাদের সাহায্যার্থ গৃহকর্ত্রীও তথায় বর্ত্তমান। রান্নাঘরের বন্দোবস্তটা কিরূপ অবশ্য জানিতে ইচ্ছা কর। আমাদের দেশের রান্নাঘর ও সূতিকাগৃহ সচরাচর

(আমি যতদূর জানি) বাড়ীর এক কোণে, অন্যান্য ঘরের সহিত প্রায় সম্পর্ক থাকে না। এখানে বাড়ীর সেরূপ বন্দোবস্ত নহে এবং রান্নাঘরের ও অপরাপর ঘরের সহিত সেরূপ ভাসুর ভাদ্র-বধু সম্পর্ক নাই। বোধ হয় জান, এখানকার সকল বাটীরই প্রায় প্রথম তোলা মাটীর নীচে। রান্না-ঘর প্রায় এই তোলাতেই দেখিতে পাই। আমি অনেকানেক বাড়ীর রান্নাঘর দেখিয়াছি। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথায় একটুকু ময়লা বা ঝুল দেখি না। ঝুল না হইবার কারণ; উননের উপর হইতে ছাত পর্য্যন্ত একটী নল থাকে, সমস্ত ধুঁয়া সেই নল দিয়া বাহির হইয়া যায়, কাজে কাজেই ঝুল হয় না এবং ধুঁয়াও হয় না। উনুন যে লোহার তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। উনুনের তিন কুটুরি (Compartments)। মধ্য-কুটুরিতে আগুন, ইহার উপর সিদ্ধপক্ক ভাজাভুজি ইত্যাদি রন্ধন কার্য্য হয়। এই আগুনের তাপে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা জল গরম হইতেছে, অপর দিকে (Oven) অর্থাৎ যাহাতে পিঠা (Pastry) ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। রাত্রের ৪।৫ ঘণ্টা ব্যতীত সমস্ত

দিন রাত উনুনে আগুন আবশ্যক। মনে কর সকালে উঠিয়াই হাত-মুখ ধুইবার জন্য গরম জল চাই, পরে গরম গরম বাল্যভোগ (Breakfast), পরে হয়ত কেহ স্নানের জন্য গরম জল ফরমাইশ করিলেন, পরে প্রধান ভোজন (Dinner), পরে গরম চা চাই—এইরূপ দিনরাত্রি রাবণের চুলা জ্বলিতেছে! কাঠের পরিবর্ত্তে কয়লা ব্যবহার হয়, বলা বেশীর ভাগ। হাঁড়ি সরার পরিবর্ত্তে ধাতুময় পাত্র ব্যবহার এবং সেই সব পাত্র কিরূপ তাহা ইংরাজ-রাজের কল্যাণে তোমার অগোচর নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাঁধিবার আয়োজন পূর্ব্বদিন হইতে হইয়াছিল। আতপ চাউল, মুসুরির ডাল (মুগের ডাল পাওয়া গেল না), কড মৎস্য, আলু, পেঁয়াজ, কারি-পাউডার (মসলার গুঁড়া), কাঁচা লঙ্কা, মধু অভাবে গুড়ের বন্দোবস্তের মত সরিষার তৈলের অভাবে অলিভ-তৈল (Ovil Oil) ইত্যাদি প্রস্তুত ছিল। মুসুরির ডাল এক রকম নির্ব্বিঘ্নে নামিল, তবে ঘি পাওয়া যায় না, ঘিয়ের অভাবে মাখনে কাজ সারা গেল। পরে সমস্যা, মাছের ঝোল রন্ধন। মাছ প্রথমে

ভাজিতে হইবে। তেল চাপান গেল। বরাবর থিওরিতে আমরা সকলেই পণ্ডিত, সকলেই বলিলাম কাঁচা তেলে মাছ দিলে মাছ ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু তেল কখন্ ঠিক হইল জানিবার উপায় কি? একজন বলিলেন হইয়াছে, আর এক জন বলিলেন, হয় নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, পরে অনেক তর্ক বিতর্কের পর (পার্লামেণ্ট মহাসভায় সেরূপ তর্ক হয় কি না সন্দেহ) স্থির হইল যে তেল অধিক উত্তপ্ত হইলে জ্বলিয়া উঠা সম্ভব, নিরাপদের দিকে থাকাই ভাল; তেল হইয়া থাকে ভালই, নচেৎ জ্বলিয়া উঠা অপেক্ষা কাঁচা তেলে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। মাছ তেলে দেওয়া গেল, অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইল (Too many Cooks spoil the dinner), মাছ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন নিজের অজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া আর এক থিওরি বাহির করা গেল।—লোনা মাছ ভাজিতে গেলে এইরূপ ভাঙ্গিয়া যায়, তৈল ঠিক হউক আর নাই হউক। যাহা হউক সেই খণ্ড খণ্ড মাছের সহিত আলু পিঁয়াজ মসলার গুড়া ও লঙ্কা দিয়া ঝোল নামান গেল। ভাত গৃহকর্ত্রী

রাঁধিয়া দিলেন। অম্বল রাঁধিবার জন্য এক রকম টক-আপেল ফল আনাইয়াছিলাম, কিন্তু কতকটা শ্রমে ও কতকটা তর্ক বিতর্কে জঠরাগ্নি এত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে, আর বিলম্ব সহ্য হইল না, রন্ধন হইবার পূর্ব্বেই তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল। ডিনার প্রস্তুত হইল, টেবিলে আসিয়া উপস্থিত। অনেক দিনের পর এরূপ খাওয়া, সেই জন্য রন্ধন যেরূপই হউক খাইতে অতি পরিপাটী বোধ হইল। তাহার পর হইতে গৃহকর্ত্রী (সেদিন শিখিয়া) মধ্যে মধ্যে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া দেন। আমরা যাহা পাক করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা তিনি ভাল পাক করেন।

বিলাতী-দোল।

১৯শে অক্টোবর।

গত রবিবার রাত্রি ৮-টার সময় আগুনের ধারে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ

রাস্তায় লোকের কলরব এবং গাড়ী ঘোড়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। একি?—অন্য দিনত এমন হয় না, আজ এমন হলো কেন? কারণটা কি জানিবার জন্য অবশ্যই বাসনা বড় বলবতী হইল। কিন্তু অলস বাঙ্গালী শীতের সময় ঘরের কোণে আগুন পোহাইতেছে,—সহসা সে কিরূপে উঠে বল? উঠিয়া ব্যাপারটা দেখি কি না দেখি, এইরূপ সন্দেহ-দোলায় আরোহণ করিয়া ঘুরিতেছি, এমন সময় আমাদের ল্যাণ্ডলেডী ঘরের মধ্যে কি একটা কার্য্যের জন্য প্রবেশ করিলেন। ল্যাণ্ডলেডী কি বুঝিলেত?—অর্থাৎ যাঁর ঘরে আমি আছি—গৃহকর্ত্রী। তিনি যেন আমার মনের ভাব বুঝিয়াই বলিলেন,—"এ কিসের গোল জানেন?" আমি বলিলাম "না।" গৃহকর্ত্রী তখন আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন—"হাটতলায় মেলা হইবে, তাই আজ ব্যাপারীরা গাড়ীতে করিয়া জিনিস পত্র লইয়া যাইতেছে; অনেক লোক জন জমিবে, অনেক মজা আছে (There will be great fun); দেখিতে যাইতে পারেন।" একটা কথা বলে যাই, গৃহকর্ত্রীটী • মিস (কুমারী)—অর্থাৎ

অবিবাহিতা রমণী। তাঁহার রসিকা হইবার সাধ টুকু বিলক্ষণ আছে—তবে প্রায় অর্দ্ধেক সময় সে সাধ পূর্ণ হয় না। সহরের সকল খবরই তিনি জানেন,—তাঁহাকে চলচ্ছক্তি-বিশিষ্ট জীবন্ত টাই-মৃস সংবাদপত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সহরে কোথায় কি হইতেছে, কে কবে কোথায় বক্তৃতা করিবে, কাহার কবে কোথায় নিমন্ত্রণ হইবে, কোন্ রমণীর সহিত কোন্ পুরুষের বিবাহ হই-বার কথা হইতেছে, কে কাহাকে কতখানি ভাল-বাসে, কে কেমন লোক—ইত্যাদিরূপ বিবিধ-বিষয়িণী, ডালপল্লবরঞ্জিতা, ফলপুষ্পশোভিতা পৃথিবীর সার কথা সকল তিনি মধ্যে মধ্যে আমা-দিগকে বলিয়া থাকেন।

যাহাহউক, গৃহ-সুন্দরীর কথা শুনিয়া বুঝিলাম, কাল রাত্রে যে দোল হইবে, আজ তার চাঁচর। মেলাকে দোল বলিবার কারণ পরে বুঝিবে, এখন ব্যস্ত হইও না। তখন আর থাকিতে পারিলাম না, বনেদী আলস্য ছাড়িলাম, আগুনের কাছ ছাড়িলাম, বাহিরে আসিলাম,—ক্রমে হাটতলায় উপস্থিত! হাটতলাটা কি?—বোধ হয় একটু

টীকার আবশ্যক। এখানে, অনেক সহরের মধ্য-স্থলে এক একটা প্রকাণ্ড চৌমাথা দেখিতে পাই; ঐ চৌমাথাকে ইংরেজীতে Market Place (হাট-তলা) বলে; আমি উহার নাম বাঙ্গালায় হাটতলা রাখিলাম; এই হাটতলায় প্রতি সোমবার সামান্য রকমের হাটও বসিয়া থাকে। সহরের মধ্যে ভাল ভাল দোকান প্রায় হাটতলার চতুর্ধারে। প্রত্যহ বিশেষত শনি ও রবিবারে সন্ধ্যার পর তথায় অনেক বেকার স্ত্রীপুরুষের সমাগম হইয়া থাকে। সহরের শীর্ষস্থান, নরনারীর বিচরণভূমি হাটতলায় চাঁচর দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ব্যাপারীরা নিজ নিজ আসবাব সহিত দ্রুতবেগে অশ্বযানে আসিয়া আপনাপন স্থান অধিকার করি-তেছে। বালক বালিকাদিগের স্বভাব সর্ব্বত্রেই সমান। একখানা গাড়ী আসিল, অমনি ঘোড়ার সহিত সমবেগে তাহারাও গাড়ীর সঙ্গে দৌড়িয়া আসিল। আবার ফিরিয়া গেল; আবার এক-খানি গাড়ীর সহিত আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। পোষাক পরা, হাসি ভরা, সাদা সাদা বালক বালিকার (?) এরূপ দ্রুতগমন বড়

চমৎকার দৃশ্য! ভাই, এখানকার বালক বালিকা বিলাতী অর্থে বুঝিতে হইবে; বালিকা মানে ৮।৯ বৎসরের মেয়ে নহে। এ দেশের লোকে বলে—"তিনি কেবল ১৮ বৎসরের বালিকা," "তিনি কেবল এক কুড়ি দুই বৎসরের বালিকা"—She is merely a girl of 18,—She is merely a girl of 2 and 20. হাটতলায় প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কার অভাব দেখিলাম না,—তবে তাঁহারা এইরূপ বালক-সুলভ আমোদের বড় পক্ষপাতী নহেন,—তাঁদের আমোদ ভিন্ন প্রকার। পূর্ব্বেও দুই একটী বিলাতী-জনতা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে এরূপ বিকট অমানব চীৎকার ও জনতার সহগামী অপরাপর কুরীতি দেখি নাই। ভাই! আজিকার কাণ্ড দেখিয়া আমার মনের অনেক ভ্রম ঘুচিল। মনে করিয়াছিলাম সুসভ্য, আলোকপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্য দেশে—যে দেশের মতে পৃথিবীর অভিশপ্ত পূর্ব্বাংশ, অসভ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন; যে দেশের কোন এক মহামান্য লোক (Right Honorable) সে দিন সদ্য-বিজিত মিশরদেশকে অসভ্য প্রমাণ করিবার জন্য ভূগোলের কৃত্রিম বিভাগ পদদলিত করিয়া মিশরদেশকে

আসিয়ার অন্তর্গত করিয়াছেন—যেন আসিয়ার অন্তর্গত বলিলেই অসভ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ হইল; যে দেশের সুসভ্য গ্রন্থকর্ত্তা পাশ্চাত্যনীতি-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অসভ্য, জন্তু বিশেষ, নীতিজ্ঞান-রহিত পূর্ব্বদেশীয়কে মিথ্যাবাদী, পাজী, নচ্ছার, জুয়াচোর, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি সুন্দর-সুমধুর-সুশ্রাব্য-সার্থক-সারযুক্ত পদবীরাজি দিয়া সুসজ্জিত করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই,—মনে করিয়াছিলাম, সেই মূর্ত্তিমান নীতির আকর পাশ্চাত্য-দেশে বুঝি এ সকল নাই; আজ সে ভ্রম ভাঙ্গিল।

চাঁচর দেখা শেষ হইল, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ভাই! এবারে দোলের কথা লিখিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সেই জন্য আজ এইখানেই শেষ করিলাম।

বিলাতী-দোল।

চাঁচরের পর দোল। সেদিন সোমবার, সুতরাং নিজের কাজেই সমস্ত বেলা ব্যস্ত। রাত্রি

৮ টার সময় কাজকর্ম্ম সেরে ব্যাপারটা কি দেখিতে হাটতলায় উপস্থিত হইলাম। অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম যে, মেলায় নানা প্রকার জঘন্য ব্যাপার হইয়া থাকে, সেই জন্য প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম, তথায় না যাওয়াই ভাল, কিন্তু একদিন কথায় কথায় এদেশীয় আমার একটী ইংরেজ-বন্ধু বলিলেন, "আমরা না যাইতে পারি, তোমরা বিদেশীয়, তোমাদের যাওয়া উচিত; তোমাদের দেশের মেলা ইত্যাদি দেখিয়া এদেশীয়েরা এখানে আসিয়া তোমাদের কত নিন্দা, কত ঠাট্টা তামাসা করেন, এখন তোমাদের পালা, এ অবসর ত্যাগ করিও না।" যখন তিনি এই কথা বলিলেন, তখন আমার চট্‌কা ভাঙ্গিল, কথাটা বড় সার্থক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার কথামত তথায় উপস্থিত হইলাম। মেলায় যে-রূপ হইয়া থাকে, নানা রকমের জিনিস পত্র, খেলনা, দোকানদানি ইত্যাদি কিছুরই অভাব ছিল না। একদিকে ঊর্দ্ধে ৮ ফিট, প্রস্থে ৩ ফিট একটী স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য লোক যেমন ব্যস্ত, অন্য দিকে ২ ফিট ঊর্দ্ধ অর্দ্ধ হাত প্রস্থ

একটী বামণকে দেখিতে তেমনিই উৎসুক। এক-দিকে একজন এক গরুর পাঁচ পা তিন লাঙ্গুল বলিয়া চীৎকার করত লোকের কর্ণ বধির করিতেছে, অন্যদিকে আর একজন আর একটা কিছু লইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া তাহার চীৎকার ডুবাইয়া দিতেছে। একদল বালক বালিকা (বালিকাদের প্রয়োগ গত পত্রে বুঝাইয়া দিয়াছি) দোল্‌নায় চাপিয়া দোল খাইতেছে, আর একদল কাঠের ঘোড়ায় চাপিয়া চক্রাকার রেলের উপর দিয়া চক্র দিতেছে। ইহাতে বড় কিছু নূতন দেখিলাম না, তবে নূতনের মধ্যে ঘোড়ার চক্র বা দোলনার দোল ঘোড়ার দ্বারা বা মানুষের দ্বারা চালিত না হইয়া বাষ্পীয়-যন্ত্র দ্বারা হইতেছে। দেখ, খেলনাতেও উন্নত দেশের সহিত অনুন্নত দেশের কত প্রভেদ!

খেলনা দোকানপসারশ্রেণী সমস্ত হাটতলার মধ্যস্থলে। দুই পার্শ্বে রাহী লোকের চলিবার জন্য দুই প্রশস্ত ফুটপাথ। উপরিউক্ত দোকান-দানির সম্মুখ ভাগটা এক দিকের ফুটপাথের দিকে এবং সেই দিকে যথেষ্ট আলোক। অপর-

দিকে যে ফুটপাথটী, সেই দিকে দোকান শ্রেণীর পশ্চাৎ ভাগ,—আলোক অতি সামান্য এবং স্থানে স্থানে বেশ অন্ধকার। দুই ফুটপাথেই লোকের ভিড়; তবে অনালোক বা অর্দ্ধালোক ফুটপাথেই লোকের কিছু বেশী সমাগম এবং তাহাদের মধ্যে যুবক যুবতীর সংখ্যাই অধিক। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার অসদ্ভাব ছিল না, তবে তাহাদের সংখ্যা এদিকে বড় কম, আলোকের দিকেই বেশি। পূর্ব্বে যে দোষের কথা বলিয়াছি, তাহার রঙ্গভূমি এই অর্দ্ধালোক ফুটপাথ। অর্দ্ধালোক ফুটপাথে ঘূর্ণায়-মান ব্যক্তি মাত্রেরই হস্তে প্রায় কতকগুলি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিচকিরি; এবং যাহাদের আমোদ করিবার বেশ ইচ্ছা আছে, অথচ পয়সার দিকে বিশেষ দৃষ্টি, তাঁহারা পিচকিরির পরিবর্ত্তে পকেট-পূর্ণ চাল ও মুসুরির ডাল লইয়া বাহির হইয়াছেন। লেখা বাহুল্য যে, শীত-প্রতাপে সকলেরই আপাদ মস্তক বস্ত্রে পরিবৃত, মুখটি মাত্র কেবল অনা-চ্ছাদিত। পিচকিরির জল ও চাল ডালের বর্ষণ কাজে কাজেই মুখ ও ঘাড়ের উপর, আর স্থান নাই। অবশ্য শপথ করিয়া বলিতে পারি না

যে, যুবতীরা কেবল যুবকদিগকে ও যুবকেরা কেবল যুবতীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বারিবর্ষণ বা চাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তবে ঘটনার কি বিচিত্র গতি, কার্য্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। একটা ফুট-পাথ কত প্রশস্ত হইতে পারে বুঝিতেই পার, শত শত লোক সেই ফুটপাথে, কাজে কাজেই মধ্যে মধ্যে খুব ভীড় ও ঠেলাঠেলি হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? ঠেলাঠেলি ও ভীড়ে উভয় পক্ষের ঘেঁসাঘেঁসি বশত সেই স্থানে দোল গড়াইয়াছিল। ঠেলাঠেলি বলিয়া আগন্তুকেরা যে ভীড় ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে বিশেষ ব্যস্ত বা ইচ্ছুক, তাহা বোধ হইল না, বরং অনিচ্ছার লক্ষণই বুঝা গেল। একজনকে এই মাত্র দেখিবে, ভীড় ঠেলিয়া একমুখে যাইতেছেন, পরক্ষণেই দেখিবে ফেরৎ দলের সহিত তিনি বিপরীত মুখে আসিতেছেন। কাজের মধ্যে কেবল যাওয়া ও আসা।

হাড়ভাঙ্গা শীতে পিচকিরির বরফবৎ জল যে কি আরামের জিনিস, একবার ভাবিয়া দেখিও। কিন্তু এই শীতে কাহাকেও তাহাতে কাতর হইতে দেখা দূরে থাকুক, বরং যেন উপভোগ জ্ঞানে পুনঃ

পুনঃ তাহা পাইতে ইচ্ছুক বোধ হইল। মনে করিলাম হয়ত হস্তবিশেষ হইতে ক্ষেপণ বশত জলের বরফত্ব ধ্বংস হইয়া উষ্ণতা প্রাপ্তি হইতেছে। ইহার মধ্যেও ইতর বিশেষ দৃষ্ট হইল, যিনি যাঁহার চক্ষে ভাল লাগিলেন, তিনি তাঁহার প্রতিই বিশেষ সদয়। অনেকেই এইরূপ নিজের মনোমত এক এক জনকে বাছিয়া লইয়া তাঁহার প্রতি নিজের অনুরাগ বিশেষরূপে প্রকাশ করিতে সচেষ্টিত হইলেন; অবশ্য এ ইংরেজের দেশ; সুতরাং এই অনুরাগ-প্রকাশের চেষ্টাও ইংরাজী-সভ্যতার অনুমোদিত। অসভ্য জাতির এখনও তাহা বুঝিবার বিলম্ব আছে। যাহা হউক সুখের দিন আজ্ঞাতে অতিবাহিত হয়। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১ টায় দোল শেষ; নাট্যকারদের রঙ্গভূমি ত্যাগ। আমি গ্রন্থকার হইলে, নটনটীগণ নিদ্রাবস্থায় কি স্বপ্ন দেখিলেন বলিয়া দিতে পারিতাম।

পরদিন একটী ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিত গত রাত্রের কাণ্ড সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! ব্যাপারটা কি ?" তিনি আমার কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন "সভ্যতার উন্নতির

সহিত ইহা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।” ইহাতে যাহা বুঝিবার হয়, বুঝিয়া লও। নাপিত সকল দেশেই গল্পপ্রিয়। কামাইতে কামাইতে দেশের গল্প আনিয়া উপস্থিত করে। ঘটনাক্রমে সেইদিন নাপিতের ওখানে গিয়াছি (আমাদের দেশের মত এখানে নাপিত বাড়ী বাড়ী ফেরে না,) একথা সে কথা হইতে হইতে গত রাত্রের কথা উপস্থিত হইল। তাহার নিকট অনেক ঘটনা, যাহা দেখি নাই এবং দেখি নাই বলিয়া দুঃখিতও নহি, সেই সকল ঘটনা শুনিলাম। তাহারই নিকট ইহার ইতিহাস জানিলাম! এখানে কৃষকেরা চাসের নিমিত্ত চাকর চাকরাণী এক বৎসরের জন্য (বেশী দিন হইতেপারে কম নহে) বাহাল করে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বা অক্টোবর মাসের প্রথমে এই কার্য্য হয়। সকলের সুবিধার জন্য একটা মেলা হইয়া গ্রাম গ্রামান্তরের কৃষকেরা স্ত্রী পরিবার সহিত একত্রে একস্থানে মিলিত হইত এবং সেই সময়ে সকলে নিজের মনোমত চাকর চাকরাণী বাহাল করিত। এই প্রকারে মেলার উৎপত্তি, কিন্তু যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, মেলা এক্ষণে

ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। মনে করিও না, কেবল নাপিতের কথার উপর নির্ভর করিয়া উহা লিখিলাম, বিশ্বস্তসূত্র হইতেও পরে এই ইতিহাসই শুনিলাম। রথের সাত দিবস পরে যেমন উল্টা রথ, সেইরূপ সাত দিন পরে এই মেলার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন অত্যন্ত বর্ষা, শুনিলাম বড় কেহ আইসে নাই। অনেকের যে সাধের আশা ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। একটা কথা নোট করা আবশ্যক, পিচকিরির জল লাল বা অন্য কোন রকমে রঙ্গীন করা নহে। কেবল সাদা জল, তবে গন্ধদ্রব্য দ্বারা সংশোধিত। ইহা অবশ্যই মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক।

কলেজ-ভোজ।

এখানকার কালেজের ছাত্রদের একটী সভা আছে। সেই সভার ছাত্রগণ প্রতি বৎসর, প্রতিবেশী ভদ্রপরিবারের স্ত্রী ও পুরুষগণকে ভোজ

দিয়া থাকেন। কলেজ-হলে এই কাণ্ড হয়। স্ত্রী, পুরুষ, ছাত্র, অধ্যাপক সকলে একত্র হইয়া এক-যোগে আমোদ, আহ্লাদ, নাচ গানে বিভোল হন। এবার জাঁক জমক কিছু বেশী। নির্দ্ধারিত দিনে রাত্রি ৮-টার সময় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কলেজের সেই সুরম্য সুশোভিত হলটী নরনারীতে পরিপূর্ণ। প্রায় একশত নিমন্ত্রিত লোক আসিয়া-ছিলেন,—তন্মধ্যে প্রায় ৮০ জন স্ত্রীলোক, ২০ জন পুরুষ হইলে যথেষ্ট হইবে। মনুষ্য-উদ্যান মাঝে যেন নবমল্লিকার ফুল ফুটিয়া গেল। ক্ষীণাঙ্গী, স্থূলাঙ্গী, দীর্ঘাঙ্গী, খর্ব্বাঙ্গী—নানা শ্রেণীর মহিলা নয়ন পথের পথিক হইলেন। কাহারও হাসি হাসি মুখ, কাহারও আধ আধ কথা, কেহ গজ-গামিনী, কেহ খর্ খর্ দ্রুতগামিনী—সকলেই নির্ভয়ে পুরুষত্বকে লজ্জা দিয়া বিচরণ করিতে-ছেন। কলেজের প্রিন্সিপাল ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহা-দিগকে মধুর স্বরে সম্ভাষণ করিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন।

তাঁহাদের কেশপাশ আলুলায়িত, পৃষ্ঠের উপর বিলম্বিত; বিশেষ যে সকল মহিলার বয়স একটু

কম, তাঁহাদের এলানচুলের ছটাটা কিছু অধিক; জানি না এ বিলাতী শ্বেতাঙ্গী এলোকেশীগণ কুটিল কটাক্ষে কোন্ শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করিবেন? শুধু কেশ নহে,—তার উপর আবার গহনার বাহার দেখে কে?—নিম্ন হস্তে বালা, চুড়ি; উপর হস্তে তাগা; গলায় হার, মালা; কাণে ইয়ার রিং। বিলাতিনী ক্রমে বুঝি বাঙ্গালিনী হইয়া উঠিলেন!

বাঙ্গালীর চক্ষে ইংরেজ-মহিলার গায়ে গহনা কিছু নূতন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু এ সব অলঙ্কারে কারিকুরি বা নির্ম্মাণ-কৌশল কিছুই দেখিলাম না। এ গহনা কিসের জান?—রূপার। বালা যেন এক এক গাছা রূপার কড়া। একবার একটী পরিচিত মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম —"আপনারা রূপার বালা, রূপার হার কেমন বোধ করেন,—আমাদের চক্ষে রূপার হার নূতন জিনিস।" তিনি উত্তর করিলেন—"কি, আমা-দের ত সেরূপ বোধ হয় না—আমরা রূপার গহনা বড় ভাল বাসি, দেখুন দেখি, এ জিনিসের কেমন তুষারনিভ ধবল কান্তি!" ভাল বাসুন, আর নাই বাসুন, রূপার গহনা পরাটা এখন ফ্যাশন; এবং

মনুষ্য—বিশেষত রমণী-মণ্ডল, ফ্যাশনের দাস। সোণার গহনার উপর যে দিন বিলাতিনীদের ঝোঁক পড়িবে,—ইঁহারা যে দিন রূপা ছাড়িয়া সোণা ধরিবেন, সে দিন বুঝিব বিলাতী স্বামি-কুলের অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে,—সেদিন সেবিংসব্যাঙ্কের খাতার কৈফিয়তে ৷৹ অবশিষ্ট থাকিবে।

বাঙ্গালা গহনার খনি। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী হইলে এতদিন বিলাতে গহনার ফারম খুলিতে পারিতেন। কটকে যেরূপ সুন্দর, পরিষ্কার রূপার জিনিস প্রস্তুত হয়, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও সেরূপ হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই দেবতাদুর্লভ রূপার গহনা পাইলে বিলাতী স্ত্রী-লোকে আগ্রহসহকারে, সর্ব্বস্ব বেচিয়া তাহা ক্রয় না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু বাঙ্গালী ত তেমন ব্যবসায়ী নহে; বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ী হইতে বলা, আর অরণ্যে রোদন করা—দুইই সমান।

আমি যে দিনের কথা লিখিতেছি, সে দিন ভয়ানক শীত,—একবার একটু অগ্নির উত্তাপ কম হইলে অন্তর অমনি গুর্ গুর্ করিয়া উঠে—যেন

জমিয়া যাইবার উপক্রম হই। গৃহ-প্রাঙ্গণে, ছাদে, রাস্তাঘাটে ৩।৪ইঞ্চি বরফ পড়িয়াছে। স্ত্রীলোকদের হাতে আজ দস্তানা নাই;—অপর সময়, এমন কি গ্রীষ্মেও হাতে দস্তানা না থাকিলে রমণীর কোমল করাঙ্গুলীতে শীত লাগে; কিন্তু আজ তাহার বিপরীত। দশটী অঙ্গুলী—আজ দিগম্বরী। কিন্তু ইহাতেও ক্ষান্ত নাই। এ বিষম শীতে অনেকের হাতে পাখা দেখিলাম (তাল পাতার পাখা অবশ্য নহে।) প্রথমে মনে করিলাম, পাখা আনাটা বুঝি ফ্যাশন, তাই ইহাঁরা পাখা আনিয়া থাকিবেন,—বাতাসের জন্য নহে। কিন্তু ক্রমে বহুদর্শিতা হইয়া আসিলে, দেখিলাম, কেহ কেহ পাখার বিলক্ষণ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। মনে মনে ইংরেজ জাতির উপর একটু ঘৃণার উদয় হইল। ছি! ইংরেজ! এতটাই কি ফ্যাসনের দাস হওয়া ভাল—লোকে যে বদ্ধ পাগল বলিবে!

রাত্রি ৮॥০ টার সময় গীত বাদ্য আরম্ভ হইল। কলেজের ছাত্রবৃন্দ এবং অধ্যাপকগণ ইহাতে পূর্ণমাত্রায় যোগ দিলেন। গান বাজনার বাহবা

পড়িতে লাগিল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দুটী ভাল গায়িকা রমণী ছিলেন; সে দুটী যেন স্বর্গবিদ্যাধরী;—যেমন লাবণ্য ছটা, তেমনি সুন্দর শিক্ষা! তাঁহারা গান আরম্ভ করিলে, সকলে মুগ্ধ হইলেন, পটের পুতুলের ন্যায় স্থির হইয়া সকলে সেই গীত-সুধা পান করিতে লাগিলেন। আমাদের প্রিন্সিপালের স্ত্রী গানে তত পটু নহেন;—বাজিয়ে ভাল। তিনি বাদ্য-যন্ত্রে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিলেন। বাজনার মধ্যে কেবল মাত্র পিয়ানো, ফ্লুট এবং বেহালা ছিল। কিন্তু তাহাতেই তিনি বাজী মাত করিয়া দিলেন। গান বাদ্যের পর "বম্বাষ্টো-ফিউরিয়সো" নামক একটী উপনাটক ছাত্রগণ অভিনয় করেন। শেসে শুনিলাম, এ অভিনয় দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী বড় প্রীতি পাইয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় দশটা বাজিল। শেষে "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" জলদনির্ঘোষে এই গান গীত হইলে মজলিস ভঙ্গ হইল।—আবালবৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিসহকারে এই গানে যোগ দিলেন।

বরফে দৌড়।

২৭শে ডিসেম্বর।

আজ কাল শীত খুব কম, অর্থাৎ অন্য বৎসর এমন সময়ে যত শীত হইয়া থাকে, এবার তত নয়। কিন্তু ইহার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ভয়ানক শীত পড়িয়াছিল। সেই সময় একদিন সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে গিয়া দেখি, জলপাত্রে জল জমিয়া গিয়াছে, স্পঞ্জ (ইংরাজী গামছা), দন্তমার্জ্জনী শক্ত হাড়ের মত হইয়া রহিয়াছে। মনে করিলাম এ আবার কি? আলোর জন্য জানালার পরদা সরাইয়া দেখি, ছাদ রাস্তা, সব সাদা, যতদূর চক্ষু যায় ততদূর সাদা, রাত্রে বরফ (Snow) পড়িয়া সব সাদা হইয়া রহিয়াছে। কখনও এরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখি নাই। বাটীর বাহির হইয়া দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তাড়াতাড়ি করিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে কামাইয়া মুখ হাত ধুইয়া পোষাক পরিয়া বসিবার ঘরে উপস্থিত হইলাম। নাকে মুখে বাল-ভোগ গুঁজিয়া, মাথায় টুপী, হাতে দস্তানা, গলা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা বড় কোট

(Great Coat) অথবা এক কথায় মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে আবৃত করিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে বাহির হইলাম। পূর্ব্বরাত্রে যখন শয়ন করিতে যাই, তখন বরফের চিহ্নমাত্র ছিল না, এক রাত্রিমধ্যে বরফ পড়িয়া এমন সুন্দর হইয়াছে। যখন বাহির হইলাম, তখনও বরফ (Snow) বর্ষণ হইতেছে। বাহির হইয়া দেখিলাম, সমস্ত রাস্তা ৪।৫ ইঞ্চি বরফে পুঁতিয়া গিয়াছে। বরফ পড়িয়াছে বলিয়া লোকের গতায়াত কমিয়াছে দেখিলাম না, সচরাচর রাস্তায় লোক জন যেমন তেমনি। সকলেরই টুপী, জামা, জুতা বরফ পড়িয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, আমারও জামাযোড়া যথাসময়ে সাদা হইয়া গেল। আজ সবই সাদা, সাহেবের সাদা রঙ সাদায় মিশাইয়া গেল, কেবল আমার কাল মুখটী বাহির হইয়া রহিল। ছাতা লইবার বড় আবশ্যক নাই, বরফে কাপড় ভিজি-বার কোন আশঙ্কা নাই, ঝাড়িলেই বালির মত ঝর্ ঝর্ ঝরিয়া পড়ে। সহরের বাহিরে গিয়া যে দৃশ্য নয়নগোচর হইল, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। না দেখিলে তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা

অসম্ভব। যখন প্রথমে দেখিলাম তখন মনে এক অপূর্ব্ব. অননুভূত আনন্দের উদয় হইল—বোধ হইল যেন হঠাৎ দেবলোকে—অপ্সরাকিন্নরের দেশে উপস্থিত হইলাম। যে মাঠ পূর্ব্বদিন নব নধর দুর্ব্বাদলে আবৃত ছিল, যে বৃক্ষ পূর্ব্বদিন পল্লবশূন্য হইয়া দগ্ধ যষ্টির ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, আজ দেখিলাম সে সমস্ত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া অতি মনোহর দিব্য এক নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে। ময়দান যেন স্ফটিকনির্ম্মিত, বৃক্ষাবলী যেন স্ফটিকনির্ম্মিত। এই শোভা দেখিতে দেখিতে বরফের উপর দিয়া চলিলাম। চলিবার সময় বোধ হইতে লাগিল, যেন নদীর বালির উপর দিয়া চলিতেছি। বালির উপর দিয়া চলিতে যেমন পা পশ্চাতে সরিয়া যায়, শন্ শন্ শব্দ হয়, পায়ের চিহ্ন পড়ে. বরফেও ঠিক সেইরূপ। হাতে করিয়া তুলিলে দেখিবে, বরফ খুব হালকা ও খুব নরম, কিন্তু মুঠার মধ্যে করিয়া চাপ দিলে জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। অনেক কাল হইতে এখানকার বালকবৃন্দের বরফের-গোলা (Snow-ball) খেলা একটা বড় আমোদের খেলা শুনিয়া আসিতে-

ছিলাম, আজ তাহা দেখিলাম। দেখিলাম, কলেজের ছেলেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া উভয়ে উভয়ের উপর বরফের ডেলা নিক্ষেপ করত ঘাত-প্রতিঘাত সুখ অনুভব করিতেছে। এই খেলা যদিও ছেলেদের নামে বিক্রয় হয়, তথাচ ছেলের বাপেরাও ইহাতে যোগ দিতে ছাড়েন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বরফ যদিও নরম, কিন্তু চাপ দিয়া ডেলা পাকাইলে পাথরের ন্যায় কঠিন হয়, কাজে কাজেই বরফের ডেলার ঘাত-প্রতিঘাত খেলায় সকলেই উত্তম মধ্যম কিছু কিছু লাভ করেন। রাস্তা, ঘাট, মাঠ যেখানে বালক বালিকা দেখিলাম, সেই থানেই এই খেলা দেখিলাম। অনেকক্ষণ বরফের উপর ভ্রমণ করিয়া ও বরফের শোভা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম; সাধ মিটিল বলিয়া নহে, এদিকে আবার অন্য কাজ আছে ত, কেবল বরফ দেখিয়া বেড়াইলে ত আর চলে না।

ক্রমাগত দুই দিন রাস্তা, ঘাট, মাঠ, বাড়ী, ঘর, দ্বার, বরফে ঢাকা ছিল, তৃতীয় দিবসে অল্প অল্প গলিতে আরম্ভ হইল। এতদিন রাস্তায় কাদা বা কোন রকম ময়লা ছিল না, কিন্তু যেই বরফ

গলিতে আরম্ভ হইল, অমনি রাস্তাঘাট কাদায় পরিপূর্ণ হইল। বরফ পড়িবার সময় অপেক্ষা গলিবার সময় অধিক শীত; সে দিন হাড়ভাঙ্গা শীত। রাত্রের মধ্যে এত ঠাণ্ডা হইয়াছিল যে, সকালে উঠিয়া শুনিলাম, পুকুর রাস্তা ঘাট যে খানে জল ছিল, সব জমিয়া কঠিন প্রস্তরময় হইয়া গিয়াছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম রাস্তায় আর কিছুমাত্র কাদা নাই; সব জমিয়া হাড়ের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে এঁটেল মাটী রৌদ্রে শুকাইলে যেমন কঠিন হয় ও তাহার উপর দিয়া চলিতে গেলে যেমন ছুঁচের মত পায়ে লাগে, রাত্রের শীতে সমস্ত রাস্তাঘাটের কর্দ্দম জমিয়া ঠিক সেইরূপ কঠিন হইয়াছে। কাদার নাম মাত্র নাই। যেখানে জল ছিল তাহা জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে; যেখানে যেখানে পূর্ব্বের বরফ তখনও গলিয়া যায় নাই, সেখানে বরফ আর তুলার মত নরম ছিল না, জমিয়া প্রস্তরবৎ হইয়া গিয়াছে। বরফ পড়ার দিন যেমন গাছে বরফ লাগিয়া ঝুলিতেছিল, আজ সেরূপ নাই। বৃক্ষাবলীর রূপ ভিন্ন। গাছের ডালে এইরূপ হইয়া

বরফ জমিয়া গিয়াছে, বোধ হয় যেন সাদা সাদা পাতা বাহির হইতেছে; গাছের যে কি শোভা তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। নিকটে একটা বড় দিঘী ছিল, দেখিতে গেলাম; দেখিলাম জল জমিয়া পাষাণের মত হইয়া গিয়াছে। সেই জমাট বরফ এত স্বচ্ছ, সহজে বোঝা যায় না যে, যথার্থই জল জমিয়া গিয়াছে; ছড়ি দিয়া দেখিলাম সত্য সত্যই জমিয়া গিয়াছে। সেই খানেই শুনিলাম কাল হইতে স্কেটিং (Skating) আরম্ভ হইবে। মনে করিলাম স্কেটিংটা কি একবার দেখিতে হইবে। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে স্কেটিং-এর কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, শীতকালে জল জমিয়া বরফ হইলে, স্কেট করা, মেয়ে পুরুষের মহা আমোদ। প্রথম প্রথম দুই এক জন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম “না স্কেট করিতে জানি না!” পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইংরাজের দ্বীপবাস-সম্ভুত কেমন একটা অহঙ্কার যে, ইহাঁরা যাহা করেন, তাহা যদি অন্য কেহ না জানেন, বা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার অমনি সভ্যতার অভাব প্রকাশ পাইল। কাজে কাজেই ক্রমে অন্য উপায়

অবলম্বন করিলাম। বলা বাহুল্য, এখানে লোকের সহিত আলাপ আরম্ভ হইলেই সমস্ত কথা ছাড়িয়া প্রথমে জল বায়ুর কথা হয়। যেই দেখিলাম শীতের কথা পড়িল, অমনি আগেই বলিলাম "আশা করি এ বৎসর যথেষ্ট স্কেটিং হইবে, গত বৎসর কিছুই হয় নাই।" এরূপ স্থলে সে লোক জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা করে না যে, আমি স্কেটিং জানি কি না।

যে দীঘির কথা বলিয়াছি, পরদিন সেই পুকুরে স্কেটিং দেখিতে গেলাম। দেখিলাম পুকুরের উপর শত শত পরিণত বয়স্ক স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া স্কেট করিতেছে। স্কেট কি বোধ হয় জান। আধ হাত তিন পোয়া লম্বা প্রায় তিন আঙ্গুল চওড়া, এবং আধ আঙ্গুল পুরু এক খণ্ড লোহা লম্বালম্বি জুতার তলায় ইস্কুরুপ দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। এই স্কেটযুক্ত জুতার সহিত জমাট বরফের উপর দাঁড়াইলে জুতার তলা বরফকে স্পর্শ করে না, কেবল সেই লৌহ খণ্ডের আধ আঙ্গুল পুরু একটা ধারের উপর মাত্র তুমি দাঁড়াও। বলা বাহুল্য, জমাট বরফ অতিশয়

পিছল, শুধু পায়ে দাঁড়াইলে পা গড়াইয়া যায়, তুমি যদি এক দিকে যাইতে ইচ্ছা কর, পা অন্য দিকে যায়। এ যাহা বলিলাম তাহা অনভিজ্ঞের পক্ষে; যাঁহারা সুশিক্ষিত তাঁহারা শুধু পায়ে দূরে থাকুক, স্কেট পায়ে দিয়া স্বচ্ছন্দে সেই বরফের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। কেহ কেহ এত নিপুণ, যে বরফের উপর দৌড়াইতে দৌড়াইতে (অবশ্য স্কেট পায়ে দিয়া) স্কেটের সহিত নানা প্রকার ছবি আঁকিতেছেন। স্কেট পায়ে দিয়া ঘণ্টায় ১৫ মাইল অনেকেই যান। শুনিলাম, যখন খাল বা নালার জল জমিয়া যায়, তখন কেহ কেহ নালার উপর দিয়া চার পাঁচ ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল স্কেট করিয়া আইসেন। আমি যে পুকুরের কথা বলিতেছিলাম, তাহাতে যুবক যুবতী, বালক বালিকা, স্ত্রী পুরুষ, শত শত লোক স্কেট করিতেছে। স্কেট করিতে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বোধ হইল না, বরং উৎকৃষ্ট বলিতে ইচ্ছা হয়। রমণীকুল বিদ্যুৎগামিনী, এই এখানে আছেন, চক্ষুর পলক না পড়িতে অমনি সুদূরে উপস্থিত।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীকন্যাগণকেও স্কেট করিতে দেখিলাম; যদিও অনেকের সহিত পরিচয় নাই কিন্তু তাঁহাদের অনেককেই জানি। শত শত বালক বালিকা, স্ত্রীপুরুষ, যুবা বৃদ্ধ, একত্র হইয়া স্কেটরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এ দৃশ্য নূতন—দর্শনীয়—উপভোগ্য। ভাই! ধরাধামে এ চাঁদেরহাট দেখিয়া একবার সকলের নয়ন সার্থক করা উচিত।

বিলাতী হোটেল।

ভাই! বিলাতের এত কথা লিখিবার আছে যে, কোনটা আগে লিখি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। অনেক দিন হইতে একটা সামান্য কথা লিখিব মনে করিতেছি। আমাদের দেশে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে রাস্তায় যদি দুই দিন কাটাইতে হয়, তাহা হইলে পথে শয়নের ও আহারের যে কত কষ্ট—তাহা তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। এখন ত

কাশী বৃন্দাবন যাইবার রেলপথ হইয়াছে, সে সব দূর পথের কথা ছাড়িয়া দি। শ্রী-ক্ষেত্রে যাইবার পথের চটীর কথা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে, পল্লীগ্রামে ২০। ২২ ক্রোশ পথ হাঁটিবার কথাও জান। অনেক রাস্তায় চটি পর্য্যন্ত নাই। গাছ-তলায় ব্যাগ মাথায় দিয়া শয়ন করিতে হয়, আর যদি কিছু খাবার থাকে ত খাও, নচেৎ অনশন। দূরতর প্রসিদ্ধ স্থানে যাইতে হইলে পথে চটী আছে সত্য, কিন্তু চটী এইরূপ—নুন মেলে ত তেল মেলে না, চাল মেলে ত ডাল মেলে না, হাঁড়ি মেলে ত কাঠ মেলে না। যদি অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন হয়, চাল ডাল হাঁড়ী কাঠ মিলে ;—তখন বিষম সমস্যা, সেই গুলিকে সিদ্ধ করিতে হইবে ; কাঠ যে ভিজে,—তাহাত স্বতঃসিদ্ধ। হরিবোল হরি ! তখন মনের কথা মনে রৈল, কেবল নয়ন-জলে ভেসে গেল। ভাই ! আমাদের দেশ গরিব বলিয়াই দেশের অবস্থা এইরূপ। এইত গেল আহারের কথা ! কোন অপরিচিত গ্রামে যদি বেলা দুই প্রহরের সময় যাইয়া পৌছিলে, তাহা হইলে কোন গৃহস্থের স্কন্ধে পড়িয়া তাহাকে

জ্বালাতন করিতে হইবে ; কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি সহরে এমত অবস্থায় পড়িলে কোন উপায় নাই বলিলেই হয়।

এ সব কথা তুমি জান। কিন্তু বিলাতের এ রকম অবস্থায় লোকে কি করে ? বিলাতে যে কোন রাস্তা দিয়া যাও, সকল রাস্তাতেই, এক ক্রোশ দুই ক্রোশ বা তিন ক্রোশ অন্তর 'ঈন' বলে একটা ঘর পাওয়া যায়। সেখানে খাইবার ও রাত্রি হইলে শুইবার এক প্রকার বেশ বন্দোবস্ত আছে। চাল ডাল হাঁড়ি কাঠ কিছুরই অন্বেষণ করিতে হয় না। কষ্টের মধ্যে—কি খাইবে, কখন খাইবে, একবার মুখের কথা খুলিয়া বলিয়া দেওয়া। যথাসময়ে হুকুমমত সম্মুখে খাবার আসিয়া উপস্থিত, সকলে যেন তোমার একবারে কেনা গোলাম। আহারান্তে শয়নের জন্য স্থান পরিষ্কার করিতে হইবে না ; আর বিছানা করিতেও হইবে না। শয্যা প্রস্তুত,—কেবল শয়নের অপেক্ষা। যেমন কেন স্থান হউক না, এক দিকে ৪। ৫ মাইল গেলেই একটা "ঈন" পাওয়া যাইবে। রাস্তার ব্যবস্থাত এইরূপ। অপরিচিত

নগরে পৌঁছিয়া গৃহস্থকে বিরক্ত করিয়া তাহার বাড়ীতে পাত পাড়িবার এখানে আবশ্যক হয় না, সকল নগরেই কতকগুলি করিয়া হোটেল আছে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হোটেল। যাহার পয়সা কম, সে একটু নীচু দরের হোটেলে যাউক। আর যাহার পয়সা বেশী, সে প্রকাণ্ড সাজসজ্জায় ভূষিত বড় হোটেলে যাউক। হোটেল আর "ঈনে" এই বিভিন্ন যে ঈনে পথিকেরা প্রায়ই দুই এক পয়সা চা ও কফি বা দুই এক গ্লাস মদ খাইতে ঢুকে; অথবা ক্লান্ত হইলে বসিয়া একটু বিশ্রাম করে। যদি রাত্রি বেশী হয়, তবে পথিকেরা তথায় শয়ন করে।

সহরে হোটেল যে কেবল বিদেশী অপরিচিত লোক আসিয়া এক রাত্রি বা এক বেলা থাকে তাহা নহে; শত শত লোক আছে যাহাদের বাসা বা ঘর নাই; হোটেলেই থাকে এবং হোটে-লই তাহাদের ঘর। যাহাদের বাড়ী ঘর দ্বার আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে বাড়ীতে না থাকিয়া মধ্যাহ্নে হোটেলে খায়; বিশেষ যাহারা আপীসে কাজ কর্ম্ম করে, ডিনারের সময় বাড়ী

আসিতে সময় পায় না। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা এক হোটেলে খায় ও আর এক হোটেলে শয়ন করে—এরূপ করিলে কিছু কম পয়সায় হয়। যে হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত, সেই হোটেলে খাবার বন্দোবস্ত করিলে খিদমদ্‌গারি (attendance) বলে কিছু পয়সা লইয়া থাকে, ভিন্ন হোটেলে খাইলে এই পয়সাটী লাগে না। হোটেল ছাড়া জলখাবার, স্নান পানাদি করিবার স্থান বড় বড় সহরে যে কত তাহার সংখ্যা নাই। এই সব হোটেলে বা জলখাবার স্থানে যদি সময় মত প্রবেশ কর, দেখিবে যে শত শত লোক একবারে পান ভোজনাদি করিতেছে। যদি লণ্ডনে একটা বড় হোটেলের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখ, দেখিবে যে শত শত লোক বাহির হইয়া আসিতেছে। এখানে খাবার বন্দোবস্তটা খুব, যেখানে যাও খাবার কোন অসুবিধা নাই, লোকে খাবারটা খুব বোঝে।

তুমি বলিতে পার, ইহাতে বড় পয়সা খরচ। কিন্তু আমাদের দেশে পয়সা থাকিলেও যে রাস্তায় বা অপরিচিত স্থানে (বিশেষ সহরে) খাইতে

পাওয়া দূরে থাকুক, আশ্রয় পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না—সেই জন্যই তোমাকে এই সকল কথা লিখিলাম।

আহার।

আচ্ছা, বিলাতস্থ ইংরেজ জনসাধারণের আহারাদি কি রকম মনে কর? আমাদের দেশে গিয়া ইংরেজ বাবু হয়েন;—ভোজনের নানারূপ পরিপাটী করেন, অনেক সময় মসলার সৌরভে নাসিকা অমোদিত হয়; মদনচাপ, কারি, কোপ্তা, দমপোক্তা প্রভৃতির সুমধুর নামে রসনায় বরুণদেবের আবির্ভাব হয়। কত রকম অশ্রুতপূর্ব্ব, দুঃখহর, জীবনতোষক ব্যঞ্জনে ভারতীয় ইংরেজের টেবিল পরিশোভিত হয়, কিন্তু এখানে সাধারণ ইংরেজের মধ্যে আহারাদির ব্যবস্থা তদ্বিপরীত। বিলাতে রন্ধন-প্রণালী বড় চমৎকার—সকল জিনিস স্ব স্ব প্রধান,—একদিন কপির তরকারি হইবে শুনিয়া প্রথমে মনে করিলাম, না জানি আজ

কি একটা অপূর্ব্ব জিনিস খাইব,—বিলাতী কপির বিলাতী তরকারি!—ওমা শেষে যেয়ে দেখি, একটা গোটা কপি সিদ্ধ,—তাহাতে ঝাল হলুদ নাই, নুন তেল ঘি কিছুই নাই—একটা আস্ত, আধমরা কপি একটী পরমসুন্দর পাত্রে অধিষ্ঠিত,—সে মূর্ত্তি দেখিয়াইত আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল,—ক্রমে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিলাম, বিলাতে ইহারই নাম কপির ব্যঞ্জন, ছুরি করিয়া এক একটু অংশ কাটিয়া লও, নুন মাখ,—কাঁটা দিয়া মুখের নিকট তুলিয়া ধর—আর বল যে উত্তম জিনিস খাইলাম, এবং গৃহকর্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বল, বিলাতের রন্ধন সামগ্রী কি চমৎকার; নচেৎ তিনি রাগ করিবেন। ভাই! এখানে সাধারণত ভোজনের ব্যাপার এই রকমই। ভেড়ার শরীরের কতকাংশ সিদ্ধ করিয়া দিল, ছুরি দিয়া কাটিয়া নুন মেখে মজা করে খাও। আলুও ঐ রকম আলাহিদা খাও—খবরদার কপির সঙ্গে যেন আলু না মিশে; যদি তুমি মিশাইতে চাও, তাহা হইলে তুমি অসভ্য বর্ব্বর হইলে। পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে মিশিয়া একটা জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে;

তাহা বিলাতের লোক যেন ধারণা করিতে অক্ষম। আমার বোধ হয় যেন আধ কাঁচা মাংস ইহাদিগকে ভাল লাগে, অনেক উদ্ভিজ্জ জিনিস সাধারণ-ইংরেজ খাইতে ভাল বাসে। বলা বাহুল্য, বেগুণ এখানে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য; একদিন একটী দোকানে আমি গ্লাস-কেসে ঢাকা একটী বেগুণ দেখিলাম; অনেক দিনের পর সেই বাল-সহচর চিরপরিচিত বার্ত্তাকু-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তৎ-প্রতি আমার কিছু লোভ জন্মিল; দর জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বলিল—এক শিলিং, অর্থাৎ আমাদের প্রায় ॥৶০ আনা; দর শুনিয়া দরিদ্রের মনোরথ "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে" হইল। রোজ বেড়াইতে বাহির হইয়া সেই বেগুণ দেখিতাম; কিন্তু একদিন আর দেখিলাম না, বেগুণটী কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, একটী স্ত্রীলোক কল্য কিনিয়া লইয়া যায়, এবং সে অদ্য আসিয়া আমাকে প্রতারক বলিয়া বিলক্ষণ ভৎর্সনা করিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসিলাম, কেন? দোকানদার বলিল—"সেই স্ত্রীলোক বেগুণ খাইতে যাইয়া দেখে উহার

কোনও আস্বাদন নাই।” একথা শুনিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাল, বলিলাম বেগুণ কাঁচা খাইতে নাই ; আলু, বেগুণ, মাছ একত্রে মিশাইয়া ঝাল হলুদ প্রভৃতি মস্‌লা দিয়া রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। একথা শুনিয়া দোকানদার অবাক্ হইল, সকল জিনিস একত্রে মিশাইলে জিনিসের আস্বাদন নষ্ট হয়, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। যাহা হউক, ভাই! এখানে আলুসিদ্ধ, কপিসিদ্ধ, মাংসসিদ্ধ ও রূটী, ইহাই আহারের ব্যবস্থা,—এইরূপই প্রতি-নিয়ত চলিতেছে—কথায় বলে, খাড়া বড়ি থোড়, আর থোড় বড়ি খাড়া,—ইহাই বিলাতবাসীদের অদৃষ্টের লিখন।

এইবার বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে, আধু-নিক সভ্যতার নেতা, ইংরাজ-জাতি রন্ধন বিষয়ে ইংলণ্ডের আদিমবাসী ব্রিটনের সময় হইতে বিশেষ কিছুই উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। আমি যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা তাঁহাদের রন্ধনের দোষ দেখিতে পান না, বা তাঁহারা সুন্দর সুপাক খাদ্য উপভোগ করিতে জানেন না। বিলাতের যে কোন উৎকৃষ্ট নাম-

জাদা হোটেলে যাও, দেখিবে ফরাসী পাচক এবং ফরাসী রন্ধন-প্রণালী। ফরাসীরা রন্ধন-কার্য্যে ইংরেজ অপেক্ষা সহস্র গুণে পটু। প্রায় সকল ইংরেজই মনে মনে ফরাসী পাচক ভাল বাসেন, এবং ফরাসী রন্ধন-সামগ্রী মহাপ্রসাদ বলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু হোটেল হইতে বাহিরে আসিয়াই শুনিবে, যাঁহারা এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ফরাসী পাকের প্রশংসা করিয়া রসনাতৃপ্তি করিয়া আসিলেন, তাঁহারাই আবার পর মুহূর্ত্তে ফরাসী রন্ধন সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে নাসিকা উত্তোলন করিতেছেন এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিতেছেন, ফরাসীরা কি অসভ্য, নানা দ্রব্য একত্রে করিয়া পাক করে। দ্বীপে বাস, সুতরাং কি রকম একটা দ্বীপবাসসম্ভূত অহঙ্কার, তাঁহারা কোন বিষয়ে অপর কোন দেশের প্রাধান্য সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। এই দ্বীপ-বাসসম্ভূত অহঙ্কারের আভাস পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং বোধ হয় এই অহঙ্কারই ইংরেজ জাতিকে বড় করিয়াছে। ভিন্ন দেশের লোকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি যে ভিন্ন হইতে

পারে, ইহাঁদের অনেকের নিকট তাহা অসম্ভব, আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কাঁটা চাম্‌চে ও টেবিল ভিন্ন অন্য কোন রকমে খাওয়া যায়, তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। অপর জাতির পোষাক ভিন্ন হইতে পারে, ভাষা ভিন্ন হইতে পারে কি রকমে, তাঁহারা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে লজ্জাজ্ঞান ও আদব-কায়দা আমাদের সহিত তুলনা করিলে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। এক টেবিলে ৪।৫ জন খাইতে বসিলে একজন সকলকে ভাগ করিয়া দেন, তাহা অবশ্য তোমার জানা আছে। আমাদের নিয়ম, সকলের পরিবেশন হইলে পর, একত্রে খাইতে আরম্ভ করা হয়, কিন্তু এখানে ভিন্ন নিয়ম; যিনি যখন পাইলেন, তিনি কাহারও জন্য অপেক্ষা না করিয়া “শুভস্য শীঘ্রং” নীতি অবলম্বন করিয়া শীঘ্রহস্তে আরম্ভ করিলেন। কেহ কাহারও অপেক্ষা করেন না। মেয়েদের মধ্যেও খাওয়ার বিষয়ে কোন লজ্জা নাই। রেলওয়ে গাড়ীতে যাইতে যাইতে প্রায়ই দেখা যায় যে ভদ্র মহিলারা চক্ষু

লজ্জা বা কাহারও খাতির না করিয়া বেশ পান-ভোজনাদি করিতে লাগিলেন। যদি বল, তাঁহারা ভদ্র মহিলা কি করিয়া বুঝিলে? পোষাক ও শ্রী দেখিয়া সকল দেশেই ভদ্র লোককে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত যাঁহারা রেল-ওয়ে গাড়ীর প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ভদ্র সমাজের রমণী বলিয়া অনায়াসে ধরা যাইতে পারে। অনেক স্ত্রীলোককে দেখি-য়াছি, লণ্ডনের রাস্তায় কাহারও উপর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেক্ (Cake) বিস্কুট (Biscuit) খাইতে খাইতে চলিয়াছেন।

ভাই! অনেকে ভাবেন, বিলাতের সব ভাল। কিন্তু! আমি অন্ধ বলিয়াই হউক, অথবা তেমন গুণজ্ঞ নহি বলিয়াই হউক—আমার এ পাপ চক্ষে আমি বিলাতের অনেক জিনিস মন্দ দেখি।

বিলাতী দুর্গোৎসব।

৪ঠা জানুয়ারি।

বাঙ্গালীর ছেলে, বাল্যকাল হইতে দুর্গোৎসব দেখিয়া আসিয়াছি। এবার সাহেবের দেশে, দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে বড় দিন দেখিলাম। যদি জিজ্ঞাসা কর, বড় দিন উপলক্ষে কি দেখিলাম, কি জানিলাম, কি শিখিলাম,—ইহার এক কথায় সংক্ষেপে এই মাত্র উত্তর দিব, বড় দিন ইংরেজের দুর্গোৎসব। উৎসবের ৭।৮ দিন পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে লোকের জনতা, রেলওয়ে গাড়ীতে ভীড়, ব্যাগ ও পোর্টম্যাণ্টোর স্তূপ—এই সব দেখিয়া বুঝিলাম, ইহাদের বৎসরের প্রধান উৎসব আসিতেছে। বিলাতের প্রধান প্রধান ষ্টেশনে লোকের ভয়ানক ভীড় দেখিলাম সত্য, কিন্তু অত্যাচারের লেশ মাত্র নাই। ভাই! এ সময় আমাদের হাবড়ার ষ্টেশনের কথা মনে পড়িল। টিকিট কিনিবার ভয়ে, অপমানের ভয়ে কতবার তৃতীয়

শ্রেণীর টিকিট কিনিতে পারি নাই; শুধু আমি নই, অনেকেই ভুক্তভোগী। শান্তিরক্ষকের কর-তাড়নার কথা মনে পড়িলে হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হয় যে, আমরা পরাধীন জাতি, অর্দ্ধচন্দ্র সহ্য করিতেই আমাদের জন্ম। জন্মভূমে অনেক সময় টিকিট-মাষ্টারদের অশ্রাব্য কটূক্তি শুনিয়াছি, মাল-ওজন বিভাগের বড়কর্ত্তাদের অভদ্রতা, গার্ড ও ষ্টেশনমাষ্টারদের সময়ে সময়ে যাত্রীদের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার দেখিয়াছি—ভাই! এখানে এ সব কিছুই দেখিলাম না। আর গাড়ীর কামরার মধ্যে মাল বোঝায়ের মত, লোক বোঝাইও দেখিলাম না। সে হুড়াহুড়ি, তাড়াতাড়ি, হাঁকাহাঁকি, মারা-মারি কিছুই নাই। এখানকার রেলওয়ে কর্ম্মচারী-গণ যাত্রীদিগকে প্রীত করিবার জন্য, বাধিত করি-বার জন্য, সর্ব্বদা শশব্যস্ত,—যাত্রীদের সুবিধার জন্য কত রকম বন্দোবস্ত করিয়াছেন, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। হায়রে স্বাধীন দেশ!

কেন এমন প্রভেদ হইল? রেলওয়ে কোম্পা-নীর কার্য্যের দোষে,—বন্দোবস্তের দোষে; কর্ম্ম-চারীগণের শিক্ষার দোষে; আর বাঙ্গালী যাত্রী-

গণের আত্মমর্য্যাদা-হীনতার দোষে,—এই ত্রিদোষে আমাদিগকে স্বদেশে অত্যাচার, অপমান সহ্য করিতে হয়। এখানে যদি কোনরূপ সামান্য অত্যাচার ঘটিল, অমনি চারিদিকে হৈহৈ রৈরৈ পড়িয়া গেল, সংবাদপত্রে সে কথা উঠিল, সকলে সেই রেলওয়ে কোম্পানীকে ছি ছি করিতে লাগিল, বাদ প্রতিবাদ কত রকম চলিতে লাগিল; কাজেই রেলওয়ে-কোম্পানী সমাজে অপদস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ ভ্রম সংশোধন করিলেন। আর স্বদেশে একটা অপমান, আমাদের যেন গায়ের ঘাম, মুছিলেই সমস্ত দূর হইল। ইংরেজকে আমরা দেবতা জ্ঞান করি, তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কে করে? আমরা কুঁড়ের বাদশা, প্রতিবাদের জন্য কলম চালায় কে?—আর আমাদের আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান নাই, প্রতিবাদের আবশ্যকই বা কি?

বড় দিনে ত এখানে রেলপথে এইরকম লোকে লোকারণ্য, হাট বাজার দোকান পসারেও এইরূপ জনতা, এইরূপ সজীব ভাব। দোকান মৌচাক বিশেষ,—মধুকর ঝাঁকের ন্যায়, সেই

দোকান-মৌচাকে মানুষের ঝাঁক দেখ, আর কেবল মাথা গণনা কর। ক্রেতা কে? আমাদের দেশে পূজার সময় বা কোন পর্ব্বোপলক্ষে পুরুষে হাট বাজার করিয়া আনিয়া রমণীমণ্ডলকে সাজায়। এখানে তদ্বিপরীত। স্ত্রীলোকে বাজার করিয়া পুরুষকে সাজায়। তাই বলিতেছি, ক্রেতা কে?—পুরুষের বদলে মেয়ে। আজ বাজারে পনের আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া স্ত্রীলোক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনে হইল, যেন, আজ নারী-দেশে উপস্থিত হইয়াছি; যে দুই একটী পুরুষ দেখিলাম, তাহারা রমণী-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। ভাই! তুমি বোধ হয় জান, হাট বাজার করা (Shopping) এখানে স্ত্রীলোকদের একচেটে। বুঝি পুরুষগণ গুরু কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের সময় কুলায় না, তাই স্ত্রীলোকগণের উপর বাজার করার ভারটা আছে। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীলোকদের সময় কাটাইবার ইহা বেশ উপায়; যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা বলেন, স্ত্রীলোকের ফ্যাশান্‌জ্ঞান অধিক, পছন্দ ভাল, দর করেন ভাল—যে কোন কারণেই হউক,

বিলাতিনীগণ বাজার করিতে বড় ভাল বাসেন, এবং শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি এ বিষয়ে পুরুষাপেক্ষা সহস্র গুণে পটু। সে যাহাই হউক, ক্রমশ স্ত্রীলোকের বাজার করা প্রবৃত্তিটা এত অধিক হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে রোগের মধ্যে ধরা উচিত। স্ত্রী, কন্যা একবার বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া বাজার করিতে বহির্গত হইলে, বাটীর কর্ত্তার মহা বিপদ উপস্থিত হয় ;—তিনি শ্রীমধুসূদনের নাম জপ করিতে আরম্ভ করেন। বিলাত সভ্য দেশ, সমাজের অনুমোদিত কার্য্যে ব্যাঘাত দেওয়া অসভ্যতার একশেষ; কাজেই প্রয়োজনীয়, নিষ্প্রয়োজনীয়, সুন্দর অসুন্দর, ভাল মন্দ যে কিছু তাঁহারা কিনিয়া আনিলেন, পুরুষকে দগ্ধ প্রাণে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া মধুর সম্ভাষণে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। জলেই ডোব আর আগুনেই পোড়, তাহা তোমাকে নিতে হইবে। বিপদের উপর বিপদ,—বাজার করিতে হইলে নগদ সিকি পয়সারও আবশ্যক করে না। দোকানে গিয়া জিনিস পছন্দ করিয়া মূল্য স্থির করত ঠিকানা দিয়া আসিলেই হইল। যথা সময়ে বিল ও

জিনিসপত্র তোমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। তাই বলি বিপদের উপর বিপদ। রোগ ক্রমে এত সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে যে, সংবাদপত্রের সর্ব্বজ্ঞ সম্পাদকেরা রোগের ঔষধ আবিষ্ক্রিয়ার জন্য জনসাধারণ হইতে মধ্যে মধ্যে আহূত হইয়া থাকেন।

সকল জিনিস অপেক্ষা (খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত) কার্ডেরই অধিক কাট্তি। কার্ড কি, বোধ হয় জান। বড়দিন ও বৎসরের নূতন দিন উপলক্ষে ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ, সকলে নিজ নিজ পরিচিত লোকের নিকট—এক একখানি কার্ড পাঠাইয়া থাকেন। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, যুবা, জীব জন্তু, গাছ পালা, লতা পাতা ইত্যাদি নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ছবি; এবং "আমার ভাল বাসার চিহ্ন স্বরূপ," "আশা করি নূতন বৎসর সুখে যাউক"—ইত্যাদি শত শত প্রকার প্রণয়, প্রীতি ও সৌদার্দ্দসূচক মন্তব্য (Motto) এই সকল কার্ডে লিখিত থাকে। কার্ড পাঠান প্রথা যখন প্রথমে চলন হয়, তখন যে ইহা যথার্থ প্রণয় ও ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ ছিল, তাহার আর সন্দেহ

নাই। কিন্তু কোন কার্য্যেরই বাড়াবাড়ি ভাল নহে, ভালবাসারও অত্যাচার আছে! কার্ড পাঠান প্রথারও ঠিক সেই রকম হইয়াছে। অদ্য-কার টাইম্‌স পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব আছে—"একজন আমেরিকার নিগ্রো যেমন তাহার কোমরে কতগুলা মাথার খুলি ঝুলি-তেছে, গণনা করিয়া গৌরব বিবেচনা করে, এক-জন বারাঙ্গনা যেমন তাহার প্রণয় কটাক্ষের জয় পাতাকা স্বরূপ বাহুস্থিত বলয়রাজি দেখিয়া মদ-গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, তেমনি একজন (এদেশীয় স্ত্রীলোক) প্রাপ্ত-কার্ডের সংখ্যা গণনা করিয়া স্পর্দ্ধায় স্ফীত হইয়া থাকেন।" বলা বাহুল্য, নব্য সম্প্রদায় মধ্যেই কার্ড পাঠানর অত্যাচারটা অধিক হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিবার আছে।

বিলাতী দুর্গোৎসব।

২।

১২ই জানুয়ারি।

রূপবতী, গুণবতী, বীর্য্যবতী ইংলণ্ড বড়দিনের সময় এক অতি প্রশান্ত, গম্ভীর, মধুময় ভাব ধারণ করেন। ভাই। সে আনন্দে—সে সুখের মৃদু-মন্দ অস্ফুট কোলাহলে আমি যোগ দিতে পারি নাই। স্বাধীন জাতির সুখে পরাধীন জাতি, দরিদ্রজাতি কেমন করিয়া যোগ দিবে?—সুখের কি গোঁজা-মিলন চলে? বিলাতবাসীর গৃহে গৃহে আজ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব—বিলাত আজ প্রস্ফুটিত নন্দনকানন—প্রফুল্ল মন্দারপুষ্পের সৌরভে দিক্ আমোদিত—স্বয়ং কুবের কোটী কোটী অনুচরের সহিত ভাণ্ডারী, বেশভূষায় ভূষিত, প্রস্ফুটিত কমলমুখী রমণীকুল যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী—পৃথিবীকে পবিত্র করিতে ভূতলে অবতীর্ণা। অর্থহীন, সামর্থ্যহীন, কাঙ্গাল বাঙ্গালী আমি

বিলাতবাসীর এ ষড়ৈশ্বর্য্যের বিভব মহিমা কি বলিব? ভাই! তুমি আজ এ সকল ব্যাপার দেখিয়া সত্য সত্যই চোকের জল রাখিতে পারিতে না। মনে মনে সাধ হয়, একবার স্বজন, স্বদেশী সকলকে সঙ্গে আনিয়া বিলাত দেখাই— এ দৃশ্য দেখিলে হৃদয় কতদূর উন্নত হয়, কতদূর শিক্ষালাভ হয়, তাহা কে বলিবে?

দুর্গোৎসবের সময় আমাদের বন্ধুবান্ধবের সহিত পরস্পর মিলন হয়; স্বামী দেশ-দেশান্তর হইতে চাকুরি করিয়া আসিয়া অৰ্দ্ধাঙ্গীর সহিত মিলিত হয়েন, মাতা পুত্রের চাঁদমুখ দর্শনে আপার আনন্দ সলিলে মগ্ন হয়েন শক্তিরূপিনী জননী ভগবতী বঙ্গে শুভাগমন করিলে বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে আনন্দের খরস্রোত বহিয়া যায়। বিলাতেও আজ তদ্রূপ সুখ-সংমিলন, সুখভোগ, সুখের হাটে বেচাকেনা পড়িয়া গিয়াছে। তবে বিলাতে প্রায় স্ত্রী ছাড়া স্বামী নাই, স্বামী ছাড়া স্ত্রী নাই—ছায়ার ন্যায় রমণী, স্বামীর অনুগমন করিয়া থাকেন, সুতরাং বিচ্ছেদের পর যে অনন্ত অপরিমেয় সুখ, তাহা বিলাতিনীগণ

ভোগ করিতে পারেন না। এখানকার নিয়ম,—পুত্র কন্যা, যে স্কুলে পড়েন, প্রায়ই বার মাস সেই স্কুলে থাকেন,—সেইখানেই অধ্যয়ন, আহার ও শয়ন। বড়দিনের সময় সন্তানগণ ঘর গুলজার করিয়া তুলিয়াছে। পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, কন্যা ভ্রাতা, জামাতা, সকলে এ সময় মিলিত হইয়া সাংসারিক বিবাদ বিসম্বাদ শোক দুঃখ ভুলিয়া নির্ম্মল পারিবারিক সুখে নিমগ্ন হন। কিন্তু একটা বিশেষ এই, আমোদ বল, আহ্লাদ বল, সুখ বল, সম্ভোগ বল,—যা কিছু সবই নিজ গৃহ-মধ্যে; জন সমাজে আজ বড় কিছুই প্রকাশ নাই—আমাদের দুর্গোৎসবের সময় কত লোকের বাড়ীতে গান যাত্রা নাচ হইতেছে, কত ধনাঢ্যের গৃহে লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি হইতেছে, এখানে গানযাত্রা-রও কোন, বন্দোবস্ত নাই, কাহারও আজ ফলারের কোথাও বন্দোবস্ত নাই—কেবল আপন আপন ঘরে ঘরে বসিয়া ভাল রাঁধিয়া বাড়িয়া খাও আর আমোদ কর—বাহিরের লোকের সহিত "কাকস্য পরিবেদনা"। বড় দিনের পূর্ব্ব কয়েক দিন সর্ব্বত্র ভয়ানক গোলমাল ছিল,—কিন্তু আজ সব

নিস্তব্ধ। বাহির হইয়া দেখিলাম, রাস্তা ঘাটে জনপ্রাণী নাই, সহর যেন লোকশূন্য—রেলওয়ে ষ্টেসনে গিয়া দেখি ষ্টেসনের দ্বার রুদ্ধ—গমনাগমন নাই—পোষ্টাফিস পর্য্যন্ত বন্দ। আজ সকলেই নিজ নিজ গৃহমধ্যে নিজ নিজ পরিবারের সহিত আমোদে উন্মত্ত। এই পারিবারিক আমোদ আহ্লাদের মধ্যে আহারের বন্দোবস্তই প্রধান—সে দিন খাবার সরঞ্জামটা খুব নবাবী ধরণের—যাহার যতদূর সাধ্য সে ততদূর আয়োজন করে, কিন্তু সকলেই আপনার পরিবারের জন্য,—ক্ষুদ্র পিপীলিকারও কিছুতেই অধিকার নাই। গৃহমধ্যে আজ বালক বালিকাগণের গগনস্পর্শী চীৎকার, তাহাদের ধূলাখেলা, জিনিসপত্রের ঝন্‌ঝনানি শব্দ, গৃহকে আমোদিত করিয়াছে। যে গৃহ অন্য দিন নিস্তব্ধ, নির্জীব, লোকশূন্য বলিয়া বোধ হয়, সে সকল গৃহ আজ সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময়ে পিতা মাতাকে, পুত্র কন্যার জন্য কিছু ব্যয় স্বীকারও করিতে হয়। নূতন কাপড়, নূতন পোষাক, নূতন জুতা পাইয়া আমাদের দেশের ছেলেরা

দুর্গোৎসবের সময় আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে। ইংলণ্ড ভিন্ন দেশ, রুচিও ভিন্ন। কার্ড কিনিয়া বন্ধুবান্ধবকে পাঠান বুড়োদের দেখিয়া ছেলেরাও শিখিয়াছে, ইহাদের মধ্যেও ইহা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সচিত্র উপন্যাস ক্রয় করা আর এক আনন্দ। যে সকল উপন্যাস পিতার পুস্তকাগারে রহিয়াছে, যে সকল উপন্যাস পাঠে পিতা বাল্যকালে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, সে সকল উপন্যাসে বালকদের মনস্তুষ্টি হয় না। নূতন পুস্তক চাই; যে সকল উপন্যাস সেই বৎসর বড় দিনের সময় নূতন বহির হইয়াছে, সেই সকল উপন্যাস চাই, না দিলে অবোধ পুত্র কন্যা গোষা গৃহে প্রবেশ করিলেন, সুবোধ পুত্র কন্যা মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। আমাদের দেশে এক বাটীতে যাত্রাগান হইলে, গ্রামশুদ্ধ লোক সেইখানে আসিয়া বিনা ব্যয়ে গীতবাদ্য শুনিয়া আহ্লাদ লাভ করে। এখানে গীতবাদ্য শুনিবার ইচ্ছা হইলে থিয়েটার, অপেরা, ফার্স, কন্সার্ট ইত্যাদি ভিন্ন উপায় নাই; এবং সেই সকল স্থানে যাইতে হইলে অবশ্যই পকেটে হাত পড়ে। বড় দিনের

সময় ছেলে পিলেরা এই সকল আমোদ আহ্লাদের স্থানে যাইবার স্বাধীনতা পায়, এবং কাজে কাজেই ব্যয়ের কারণ হইয়া উঠে। যাহাহউক, এই সময়ে বালক বালিকা যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলে একরূপ অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় আমোদ আহ্লাদে মত্ত হয়, তাই বলি বড় দিন এ দেশীয়দের দুর্গোৎসব।

লোক-শিক্ষা।

১।

ভাই! আজ এক বৎসর কাল এক ধরণের পত্র লিখিতেছি। সেই সমাজের কথা, নরনারীর কথা, এদেশের বাহ্যিক শোভার কথা, জলবায়ুর কথা,—একঘেয়ে নানা কথা লিখিয়া বিরক্তি না হউক, অনিচ্ছা বশত এবার সুর একটু পরিবর্ত্তন করিলাম। এবার বাজে বিষয় ছাড়িয়া পড়া শুনার কথা লিখিবার ইচ্ছা আছে। স্বদেশ হইতে যখন বিলাত আসি, তখন শিক্ষাকমিশন

বসিবে, প্রাইমারি শিক্ষা বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইবে, শুনিয়া আসিয়াছিলাম। এখানে থাকিয়াও স্বদেশের সংবাদপত্রের সাহায্যে শিক্ষাকমিশনের গতি, কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। প্রাইমারি বা পাঠশালার শিক্ষা, শিক্ষাকমিশনের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের শিক্ষাকমিশনের কার্য্যকলাপ যতই আলোচনা করিতেছি, ততই এদেশের পাঠশালার শিক্ষার দিকে স্বভাবত দৃষ্টি পড়িতেছে! ভাই! বিলাতে এখন লোকশিক্ষা যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার হওয়াই দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ। ভাই! বিলাতের লোকশিক্ষা সম্বন্ধে দুচার কথা, এ গম্ভীর গুরুতর বিষয়—বঙ্গবাসী কি শুনিবেন না?

মনে করিও না যে বিলাতে লোকশিক্ষা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। বিলাত এখন সভ্য, স্বাধীনতাপ্রিয়, শিক্ষাপ্রিয় বটে, কিন্তু বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এদেশের জনসাধারণ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপ মধ্যে লোকশিক্ষার দিকে

ইংলণ্ডের সর্ব্বশেষে দৃষ্টি পড়িয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জর্ম্মাণরা যখন ইহার প্রথম মর্য্যাদা বুঝেন, যখন সুইজরলণ্ড, ফ্রান্স লোকশিক্ষার জন্য অগ্রগামী হইলেন, ক্রমে যখন সমস্ত ইউরোপ বুঝিল যে শিক্ষা ও জ্ঞান কেবল সামরিক পরাক্রম নহে, সর্ব্বপ্রকার জাতীয় পরাক্রমের ভিত্তি, তখনও ইংলণ্ড ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কেবল মাত্র সে দিন ইংলণ্ডের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। ইংলণ্ডবাসী এতদিনে বুঝিয়াছেন, ইউরোপ তাঁহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, আঁধারে রাখিয়া দ্রুত পদে চলিয়াছেন। বিলাতবাসী বুঝিরাছেন, জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য লোকশিক্ষার অগ্রে আবশ্যক;—দু দশ জন লেখাপড়া শিখিলে, কালেজে-আউট হইলে, দেশের মঙ্গল হয় না, বালুকা-কণার ন্যায় কোটী কোটী লোকের শিক্ষা চাই। ইংলণ্ড আরও বুঝিয়াছেন, জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি—সকলই লোকশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; এই সকল জানিয়া শুনিয়া, সমগ্র ইংলণ্ডবাসী আজ লোকশিক্ষারূপ জাতীয়-জীবন—জাতীয়-ব্যবসায় সংরক্ষণী-সমরে বদ্ধপরি-

কর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এতদিন যেমন নিশ্চেষ্ট ছিলেন, আজ কাল ইংলণ্ড-বাসী আগ্রহের সহিত, স্ফূর্ত্তির সহিত, মহাবিক্রমে চলিয়াছেন।

কুড়ি বৎসরের কিছু পূর্ব্বে এদেশের লোকের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্বাস জন্মে যে, প্রচলিত নিয়মানুসারে ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলে, লোক-শিক্ষার পরিণাম বড় আশাপ্রদ নহে। সকল ছেলেকেই স্কুলে পাঠাইতে হইবে, না পাঠাইলে দণ্ডের প্রথা হওয়া উচিত—এই বলিয়া তাঁহারা আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৭০ সালের "শিক্ষা-আইন" সেই আন্দোলনের ফল। এক্ষণে এই আইনের মর্ম্মানুসারে পিতা মাতা পুত্র কন্যাকে স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য। এই আইন প্রচলিত হইবার পর এখানে লোক-শিক্ষার যে কি উন্নতি হইয়াছে, দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত তালিকাটী দিলাম। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের লোক সংখ্যা আড়াই কোটী মাত্র।

(১) প্রাইমারি স্কুলে যত বালক বালিকা পড়িয়া থাকে;—

সাল

১৮৭০ ১৮৭৮০০০ (আঠার লক্ষ আটাত্তর হাজার)

১৮৮২ ৪৫৩৮০০০ (৪৫ লক্ষ ৩৮ হাজার।)

১২ বৎসরে বৃদ্ধি ২৬৬০০০০ (২৬ লক্ষ ৬০ হাজার।)

(২) স্কুলের উপস্থিত-অনুপস্থিত বহিতে ছাত্রের সংখ্যা ;—

১২৮০ সাল। ১৬০৩০০০ (১৬ লক্ষ তিন হাজার

১৮৮২ „ ৪১০০০০০ (৪১ লক্ষ)

বৃদ্ধি ২৪৯৭০০০ (২৪ লক্ষ ৯৭ হাজার)

(৩) গড়পড়তা উপস্থিত,—

১৮৭০ ১১৫২০০০ (১১ লক্ষ ৫২ হাজার)

১৮৮২ ৩০১৫০০০ (৩০ লক্ষ ১৫ হাজার)

বৃদ্ধি ১৮৬৩০০০ (১৮ লক্ষ ৬৩ হাজার)

দেখিলে ভাই! ১২ বৎসর মধ্যে লোক-শিক্ষা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইংরেজ-চরিত্রের প্রধান গুণ—যাহা ধরিবেন, তাহা করিবেন।

বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ নর্ম্মান লকিয়ার সেদিন কোন এক স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষে বলিয়াছেন, "লোক-শিক্ষার প্রথম ভাবের বিকাশ ফুথরের সময় হইতেই ধরিতে হইবে; কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই যে, যে লোক-শিক্ষা, জন্মের দিন হইতে প্রত্যেক মানব-শিশুর ন্যায়ানুসারে প্রাপ্য, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আমরা ৩৫০ বৎসর অপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের আধুনিক প্রথাকে ধন্যবাদ দি। গত বৎসর, ২ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক এ দেশস্থ সমগ্র আশি লক্ষ বালক বালিকার মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বালক বালিকা স্কুলে গিয়াছিল। আবার এদিকে ৫ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর বয়স্ক ৪৭ লক্ষ বালক বালিকার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ স্কুলে পড়িয়াছিল।"

লোক-শিক্ষার উন্নতির সহিত সার্টিফিকেটওয়ালা শিক্ষকের সংখ্যা অবশ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭০ সালে শিক্ষকের সংখ্যা ১২৪৬৭ এবং ১৮৮২ সালে ৩৩৫৬২। দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্কপাত দেখিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা. "উষ্টার" নামক কোন এক স্থানের ছাত্র বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র ইংলণ্ডে লোক-শিক্ষার উন্নতিশীল অবস্থা সহজে বুঝিতে পারিবে। ১৮৭৩ সালে উক্ত নগরে ৩০০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৪৪১৮ জন স্কুল-

পাঠযোগ্য বালক বালিকা শিক্ষা-সেন্‌সস্ (census) দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, তন্মধ্যে ১০০০ ছাত্র স্কুলে যাইত না, তাহাদের কিছুমাত্র শিক্ষা ছিল না এবং প্রায় রাস্তায় রাস্তায় দুষ্টামি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ১৮৮২ সালের সেন্‌সসে জানা গিয়াছে যে "উষ্টারের" সমস্ত বালক বালিকার মধ্যে কেবল ৪৩ জন স্কুলে যায় না। আমার আর অধিক লেখা আবশ্যক করে না; ইহাতেই ভাই! বুঝিয়া লও বিলাত কিরূপ স্থান। কিন্তু ইহাতেও এদেশীয়েরা সন্তুষ্ট নহেন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে স্থানীয় "সামাজিক বিজ্ঞান-সমিতির" অধিবেশনে জি, ডবলিউ হেষ্টিংস এম, পি, বলেন, "দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি বোষ্টন নামক আমেরিকার এক প্রধান নগরে গমন করি। শিক্ষাবিভাগের কার্য্যালয়ের সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, বোষ্টনের সকল স্কুলে আজ কতজন ছাত্র অনুপস্থিত। সম্পাদক উত্তর দিলেন 'আজ কয়জন' অনুপস্থিত বলিতে পারি না, কারণ আজিকার হিসাব এখনও আমার নিকট আইসে নাই, কিন্তু কল্যকার কথা বলিতে পারি। হিসাবের পুস্তক উল্টাইয়া বলিলেন

'ব্যারাম বা কোন অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত কেবল দুইজন বিনা কারণে অনুপস্থিত।' ব্যাপারটা কি বুঝিও; বোষ্টনের ন্যায় মহানগরে দুই জন ছাত্র স্কুলে অনুপস্থিত। এই উপলক্ষে হেষ্টিংস সাহেব বলেন, "দেখ, দীর্ঘকাল লোকশিক্ষা বিস্তার দ্বারা সমাজের কর্ত্তব্য জ্ঞান ও আত্মসম্মানের কত উন্নতি হইতে পারে; আইস আমরা সকলে একত্র হইয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করি, যাহাতে আমাদের লোক-শিক্ষার উন্নতি হয়, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়; 'তুমিও যাও, এবং এই প্রকার চেষ্টা কর' এই শব্দ যেন সর্ব্বদা আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।" এখনও অনেক কথা লিখিবার আছে—ক্রমে সব লিখিব। কেবল আমার এক মাত্র ভাবনা, বাঙ্গালী এ সব কথা পড়িবে কি?

লোক-শিক্ষা।

২।

ভাই! গতবারে বিলাতের লোক-শিক্ষার কথা লিখিয়াছি। বাঙ্গালী তাহা পড়িয়াছেন কি না, জানি না। পড়ুন আর নাই পড়ুন, কিন্তু এমন আবশ্যকীয় কথা আর নাই। নিধুর টপ্‌পা মুখ-রোচক বটে,—নব্য-যুবকের প্রিয়তম জিনিস বটে, কিন্তু তাই বলিয়া খেয়াল ধ্রুপদ প্রভৃতি প্রকৃত সঙ্গীতের আলাপ না করা নেহাতই অসারতার পরিচায়ক। পরিশ্রম-কাতর, ক্ষীণ-মস্তিষ্ক বিলাসী ব্যক্তি গোলাপী-সরবতেই পরিতুষ্ট,—কিন্তু প্রকৃত তেজস্বী ব্যক্তি আক্ চিবাইয়া রস লয়, নারিকেল খাইতে দাঁত ভাঙ্গার ভয় করে না। লেখা পড়া শেখা বিলাসিতার, বাবুগিরির কার্য্য নহে, চিন্তা চাই, ভাবনা চাই, মাথার ঘাম পায়ে পড়ান চাই—তবে তুমি মানুষ হইবে। চুট্‌কি স্বরে মিষ্ট কথা শুনিলে কোন ফল নাই। জানি না, বাঙ্গালী-জীবনের একটানা খর শ্রোত কবে

ফিরিবে, কবে বাঙ্গালী মাথা ব্যথাইয়া চিন্তা করিতে শিখিবে। লোক-শিক্ষার কথা আজও আবার বলিব, রাগ করিও না। বিলাতের গবর্ণমেণ্ট পাঠশালা প্রভৃতির জন্য বৎসর বৎসর কত টাকা ব্যয় করেন, জান কি?—শুনিলে অবাক্ হইবে। ১৮৭০ সালে গবর্ণমেণ্ট ঐ নিমিত্ত ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা প্রদান করেন। কিন্তু যে দিন হইতে বিলাতবাসীদের লোকশিক্ষার উপর ঝোঁক পড়িল, সেই দিন হইতে তাঁহারা শিক্ষার জন্য অধিক টাকা ব্যয় করিতে আমন্ত করিলেন। ক্রমে ১২ বৎসর মধ্যে ১৮৮২ সালে পাঠশালা প্রভৃতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪ কোটী ৩১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ড, ইউরোপ হইতে এখনও দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। ১৮৮২ সালে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে শিক্ষার জন্য লোকপ্রতি বৎসরে ৭।৵৫ ব্যয় হইয়াছে, আর ইংলণ্ডের একটী প্রধান সহর বার্মিংহামে ঐ বৎসর লোক-প্রতি ১৵১০ ব্যয় হইয়াছে মাত্র।

ভাই! আমাদের দেশের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া

দেখ,—বাঙ্গালার লোকসংখ্যা কিছু কম সাত কোটী, বিলাতের লোকসংখ্যা আড়াই কোটী। পাঠশালা প্রভৃতির জন্য এখানে গবর্ণমেণ্ট প্রায় পাঁচ কোটী টাকা ব্যয় করেন,—আর বাঙ্গালায় কত? ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা মাত্র। গবর্ণমেণ্ট স্বদেশে যে জন্য ৫ কোটী টাকা ব্যয় করিতে পারেন, বিদেশে, বিজিত দেশে সেই জন্যই ৫ লক্ষ টাকাও খরচ করিতে পারেন না। ইহা কি বিশেষ অনুতাপের বিষয় নহে? জাতীয় উন্নতির মূলগ্রন্থি—লোকশিক্ষা; যতদিন না বাঙ্গালায় অধিক পরিমাণে লোক-শিক্ষার প্রচার হইতেছে, ততদিন আর আমাদের দেশে মঙ্গলের আশা নাই।

বার্মিংহাম নগরে একটী স্কুল স্থাপিত করিতে গিয়া বিলাতের শিক্ষা-সচিব মণ্ডেলা সাহেব (M. P.) বলিয়াছেন,—"ইউরোপের সকল প্রদেশে এবং আমেরিকার অধিকাংশ স্থলে আমি এই প্রকার শত শত স্কুল দেখিয়াছি। পার্লমেণ্ট বন্ধের পর আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সুইজরলণ্ডস্থ লুসারণ নগরে কিছু দিন ছিলাম। শিক্ষাকার্য্যের সহিত আমার

কি সম্পর্ক জানিয়া, একটী ভদ্রলোক আমাকে তথাকার নূতন স্কুলগুলি দেখান। লুসারণের লোক সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার এবং অধিবাসীরা গরীব। * * *। কিন্তু তাহারা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাজপ্রাসাদের ন্যায় এক প্রকাণ্ড স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বস্তুবিষয়ক শিক্ষা দিবার জন্য অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌশলের উদ্ভাবনা এবং বিজ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য এক উৎকৃষ্ট যন্ত্রালয় (Laboratory) দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বুঝিও, এই সমস্ত একটী পাঠশালার জন্য; এই পাঠশালায় ৮০০ শত মাত্র বালকের স্থান হইতে পারে।" ইংরেজ-জাতি এইরূপ উত্তেজনা পাইয়া লোক-শিক্ষায় দিন দিন প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছে। বিলাতবাসীগণ,—জর্ম্মণী, ফ্রান্স, সুইজরলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও আমেরিকাবাসীদের বহু ব্যয়সাধ্য, বহু আয়াসসাধ্য শিক্ষা-বিষয়ক বহুদর্শিতা-জ্ঞানে বিনা ব্যয়ে জ্ঞানী হইয়া স্বজাতির উন্নতি সাধনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। উপরিউক্ত দেশ সকল ভ্রমণ করিয়া, তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী আলোচনা করিয়া, তাহাদের শুভাশুভ স্বচক্ষে দেখিয়া,

ইংরেজ-জাতি দেশ-কালপাত্রভেদে সেই সকল নিয়মাবলী ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বদেশ মধ্যে প্রচলিত করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতে পার ১৮৭০ সাল হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত এই বার বৎসর মধ্যে ইংলণ্ডে প্রাইমারি শিক্ষার কি ফল ফলিয়াছে? বস্তুত ফলাফল বিবেচনা করিবার এখনও সময় আরম্ভ হয় নাই,—নূতন শিক্ষাপ্রণালীর আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তথাচ এ দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে ভাবী শুভ-ফলের লক্ষণ ইহারই মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। বিলাতের এক জন কৃতবিদ্য মান্যগণ্য লেখক এ সম্বন্ধে বলেন,—"বালক অপরাধীর নীতিজ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, এবং যুবকদের আচার ব্যবহারের উপর ইহার শুভফল স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। বাজারী এবং দোকানদারের ভাষা শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইবে, এমন আশা করা যায়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমাদিগের বালকদিগকে অতিরিক্ত শিক্ষা দিতেছি কি না, তাহার উত্তরে আমি বলিব—'নিশ্চয় না'। আল্পস্ পর্ব্বতের এ দিকে, সকল জাতি অপেক্ষা, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী নিকৃষ্ট; যাহারা

শিক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট, যাহারা তজ্জন্য বহু ব্যয় করিয়াছে, তাহারা আজিও ক্ষান্ত না হইয়া অধিকতর যত্ন ও আয়াস করিতেছে। সমগ্র ইউরোপে শিক্ষার গতি যে কিরূপ বেগবতী, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন; ইহার একমাত্র কারণ এই, ইউরোপবাসিগণ বহুদর্শিতার দ্বারা বুঝিয়াছেন; শিক্ষা এবং জ্ঞানই সকল পরাক্রমের মূল।"

ভাই বঙ্গবাসী! সকলে মিলিয়া একবার তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ কর—"শিক্ষা এবং জ্ঞানই সকল পরাক্রমের মূল।" ভারতবাসী! একবার দ্বেষ পরহিংসা ভুলিয়া, পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া জগৎকে দেখাও, যে ভারত এক সময়ে জগতের নেতা ছিল, জগৎ যে ভারতের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল, সে ভারত আজি অবস্থা পরিবর্ত্তনে, পাশ্চাত্য-প্রদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পশ্চাৎপদ নহে। যদি জগতকে এই সুফল দেখাইয়া নিজ গৌরব রক্ষা করিতে চাও, ইউরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর;—ইংরাজ-রাজের সন্নিকর্ষ সৌভাগ্য মনে করিয়া, বহুদর্শিতা দ্বারা প্রতিপন্ন জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ লোক-শিক্ষা

বিধান জন্য বদ্ধপরিকর হও। অসার তপ-জপের কাল আর নাই। শিক্ষার কাল উপস্থিত। যদি জীবন-সমরে জয় লাভ করিতে চাও, যদি পুনরায় জগতে জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে আকাঙ্ক্ষা থাকে, এই সুযোগ ত্যাগ করিও না। যদি অদৃষ্টে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ-সন্নিকর্ষ শুভাদৃষ্ট জ্ঞানে ইংরাজি-শিক্ষায় আলোকিত হইয়া স্বদেশকে জ্ঞানালোকে পুনরুজ্জ্বল কর। হ্যাট্ কোট্ পরিয়া, চুরাট টানিয়া, টাণ্ডেম চাপিয়া, সহধর্ম্মিণীকে গাউন পরাইয়া বৃথা বাক্য-ব্যয় করিলে আর চলিবে না। কার্য্যের সময় উপস্থিত,—বিলাতী বিলাসিতার দিকে দৃষ্টি কমাইয়া, একবার ইংরাজাতির জাতীয় জীবনের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও—দেখিবে, জাতীয় শিক্ষাই ইংরাজজাতির গৌরবের মূলভূত কারণ।

নারীজাতির প্রতি সম্মান।

নাম দেখিয়া ভয় পাইও না। সমাজবন্ধনের কূটপ্রশ্ন বা ব্যবহার-পদ্ধতির গুণাগুণবিষয়ক সুগভীর প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া কাহাকেও বিরক্ত করিবার ইচ্ছা নাই। দূরদর্শন, অনুদর্শন বা ভূয়োদর্শনের বিদ্যাপ্রকাশ করিতে বসি নাই, প্রাত্যালোচন বা সমাজ-বিজ্ঞানের রহস্য পরিচয় দেওয়া এ সামান্য চিঠির উদ্দেশ্য নহে। হৃদয়গ্রাহী নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার অথবা অন্তরাত্মার উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয় পাইবার আশায় পত্র পড়িতে বসিও না। সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিতে হইলে, নীতিজ্ঞানের মস্তকে পদাঘাত না করিতে হইলে, লোকরঞ্জন বা পরচর্চ্চা অতি সহজ। মোটামুটি, সাদাসিধে দু চারি কথা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আপনারা পত্র পড়িতে অগ্রসর হউন। নচেৎ এই স্থান হইতেই নিরস্ত হউন।

এই মুখ-বন্ধ দিবার আর এক বিশেষ অভিপ্রায় "পত্রকলেবর বৃদ্ধি করা।"

ভাই! মনে কর, তুমি রাস্তা দিয়া হেলে দুলে চলিয়া যাইতেছ; গজগামিনী কোন পরিচিতা মহিলার সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল; তুমি পুরুষ, বল দেখি, এ অবস্থায় তোমার নিকট সেই মহিলা কি সম্ভাষণ আশা করিতে পারেন?—আর পৌরুষ দেখাইবার জন্য তুমিই বা তাঁহাকে কিরূপ সম্মান দেখাইবে? তোমার শিরোভূষণ হ্যাট (Hat) অমনি নিমেষ মধ্যে মস্তক ত্যাগ করত হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলে বুঝিব, তোমার কেতা দুরস্ত হইয়াছে। বঙ্কিমদৃষ্টি, গ্রীবা হেলন, ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চন বা সন্তোষব্যঞ্জক চারুশুভ্রদন্তবিকাশ যদি তোমার সেই সম্বর্দ্ধনার ও পুরুষত্বের প্রতিদান হয়, তাহা হইলে তুমি কি কখন এরূপ সম্মান দেখাইতে পশ্চাদপদ হইবে? মনে থাকে যেন স্ত্রীলোকটী তোমার পরিচিত। নিয়মানুসারে, উভয় পরিচিত, তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা "ইনি অমুক" ইত্যাকার মুখবন্ধ হইয়া হাউ আর ইউ (তুমি কেমন আছ) ও হাণ্ডশেকের (কর-

কম্পন) সহিত তাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। নচেৎ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার তোমার অধিকার নাই ও প্রতিদান পাইবার আশা দুরাশা। পরিচয় থাকিলেও সম্মান প্রদর্শনের পূর্ব্বে দেখা উচিত যে, তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? স্থান, কাল, পাত্র ও সঙ্গী অনুসারে সকলে সকল সময় পরিচয় স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। এই সকল সামান্য সমাজ-লক্ষণে অভিজ্ঞ হইবার জন্য আইন কানুন বা ধারা সার্কুলার আবশ্যক নাই, সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট। আচ্ছা, যদি ইহা তোমার জানা থাকে, তাহা হইলে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। তোমার কোন বিশেষ পরিচিত মহিলাকে ড্রয়িংরুম (বসিবার ঘর) হইতে ডিনার-হলে (আহারের ঘর) লইয়া যাইবে, বা রবিবার দিন বাটী হইতে চর্চ্চে (উপাসনামন্দির) লইয়া যাইবে, অথবা নির্ম্মল অনাবদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে হইবে; এমন স্থলে তাঁহার বিনোদনার্থ তুমি কি করিবে বল দেখি? ভ্রমণ-গল্পকামা, উপাসনা-

মন্দির-গমনোদ্যতা বা ডিনার-গৃহ-গামিনী মহিলার কোমল বাহু-বল্লরীকে তোমার বলীয়ান বাহুবৃক্ষে আশ্রয় দিয়া স্বজাতির পৌরুষ ও স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করিলে, বুঝিব তোমার আদব কায়দা জ্ঞান হইয়াছে। উদ্ভিন্ন-যৌবনা, সুবর্ণকেশা নবীনাকে বাহুর আশ্রয় দান দিয়া যেমন সম্বর্দ্ধনা করিবে, বিগত যৌবনা লোলমাংসা স্থবিরাকেও যেন সেইরূপ সম্বর্দ্ধনা করিতে মনে থাকে। আচ্ছা এ কথা গেল।

রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবার সময়, পরিচিত হউক অপরিচিত হউক, কোন স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া যাইতে হইলে তাহাকে তোমার কোন্ দিকে রাখিয়া যাইবে? রাস্তায় ঘোড়া গাড়ি চলিবার যেমন একটা নিয়ম আছে, এক স্থান দিয়া যাইতে হইলে দক্ষিণ দিক্ বা বাম দিকে রাখিয়া যাইতে হয়, স্ত্রী-পুরুষ চলিবার সম্বন্ধে তেমন কোন নিয়ম অবশ্য নাই; তবে স্ত্রীজাতিকে সম্মান প্রদর্শন করা পুরুষের সৌজন্য-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। রাস্তার যে দিকটী নিরাপদ, যে দিকে বাটী ঘর দ্বার সেই দিকে তাঁহাকে যাইতে দেওয়া উচিত।

এই সামান্য বিষয়ে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে অমনোযোগ করা নিতান্ত অলৌকিকতার চিহ্ন। অপরাধ অবশ্য বিচারালয়ে দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু সমাজ-শাসন উপেক্ষা করিতে তুমি কি প্রস্তুত আছ ?

এই প্রকারে রেলওয়ে-ষ্টেশনে গাড়িতে চাপিবার সময়, দেখিলে যে, কোন এক মহিলা সেই গাড়িতে চাপিতে উদ্যত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে যে অগ্রে গাড়িতে চাপিতে দিবে, তাহা বলা বাহুল্য। অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে গাড়ীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার অভ্যন্তর গমন প্রতীক্ষা করত দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলে সৌজন্যের পরিচয় দেওয়া হইল, নচেৎ কেবল তাঁহাকে অগ্রে চাপিতে দেওয়াত তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ; তাহা না করিলে তুমি মহা অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইলে। সৌজন্য প্রদর্শন যে নিতান্ত নিষ্ফল যায়, তাহা নহে। স্বরপরিবর্ত্তন-কুশল ইংরাজ-মহিলার অবলম্বিত-সুতীক্ষ্ণ-মিহিস্বর ধন্যবাদ আকারে তোমার পৌরুষতার স্বীকার করিলে তুমি কি যথেষ্ট পুরস্কার মনে করিবে না ?

যদি তাহাই মনে কর, যদি নারীকণ্ঠ বিনির্গত স্বরের পক্ষপাতী হও, তাহা হইলে পুনরায় সুযোগ উপস্থিত। গাড়ী এক ষ্টেশনে থামিল, দেখিলে কোন এক সুন্দরী গাড়ী হইতে বহির্গমন করিতে উদ্যত। দেখিবামাত্র অমনি যদি পূর্ব্বের মত দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া সেই সুন্দরীর বহির্গমন সুলভ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আবার পূর্ব্ববৎ মিহিস্বরের ধন্যবাদ। দ্বারের নিকট যদি তোমার বসিবার সাহস হয়, তাহা হইলে লণ্ডনের প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই সুন্দরীদের নামিবার বা উঠিবার সুবিধা করিয়া দিবে, তোমার নিকট এরূপ আশা করা যায়। এবং পুরস্কার স্বরূপ বামাকণ্ঠধ্বনি শুনিবে তাহাও নিশ্চয়। অতএব বুঝিয়া সুঝিয়া গাড়ীতে স্থান লইবে।

হুইষ্ট খেলা।

ভাই! হুইস্ট খেলা কাহাকে বলে জান কি? আমাদের দেশে তাশ খেলার মধ্যে গ্রাবু খেলা যেমন প্রিয় পদার্থ, এখানে হুইষ্ট খেলা সেইরূপ। আমাদের দেশে যেমন বিন্তী, গোলাম-চোর, ডাকতুরুপ প্রভৃতি নানা রকমের, নানা কৌশলের তাস খেলা প্রচলিত আছে, বিলাতেও সেইরূপ খেলার বাড়াবাড়িটা কোন অংশে কম নহে। তবে হুইস্ট খেলাটারই সমধিক সমাদর।—চারিজন নিষ্কর্ম্মা লোক একত্র হইলে এই খেলাই হইয়া থাকে। আবার যাঁহাদের বাতিক কিছু অধিক, তাঁহারা তিন জন হইলেও একটা সাক্ষীগোপাল রাখিয়া খেলিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশে বাল্যকালে সমবয়স্কগণ খেলিতে না লইলে "সূর্য্যি মামার" সঙ্গেই একমনে খেলিয়াছি—কিন্তু বিলাতের প্রাপ্ত-বয়স্ক সচেতন নরনারীগণ যে এরূপ অচেতন পদার্থের সহিত খেলা করেন, তাহা জানিতাম না।

বলা বাহুল্য, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই এটী বড় প্রিয় খেলা। তবে রমণী মণ্ডলীর ইহার উপর কিছু বেশী অনুরাগ বলিয়া বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় কাহারও বাড়ী চা খাইবার নিমন্ত্রণ হইল,—আহারান্তে গৃহস্বামিনী হুইষ্ট খেলার প্রায়ই প্রস্তাব করেন। সন্ধ্যার সময় কোন বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাও, খেলিবার কথা অগ্রে উত্থাপন হইবে। খেলিব না বলিয়া একেবারে অস্বীকার করাটা বড় রূক্ষ ব্যবহার; বিশেষ যদি কোন চারুহাসিনী এ বিষয়ে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে "না" বলাটা মহাপাপ মধ্যে গণ্য—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না জানি না। বিলাসপ্রিয় বলিয়াই হউক, অথবা তাদৃশ কাজকর্ম্ম নাই বলিয়াই হউক, এ দেশের মেয়েরা খেলায় বেশ তৎপরতা এবং নৈপুণ্য দেখান; এবং খেলার জন্য সময়ে সময়ে বিশেষ পীড়াপীড়িও করিয়া থাকেন। তোমার গৃহদাহ হউক, ঘরে ডাকাত পড়ুক, অথবা তোমার মাঝ উঠানে বজ্রপাতই হউক,—শত সহস্র গুরুতর অভাব জানাও, তথাচ ক্ষমা নাই—রমণী মধুর কণ্ঠে বলি-

বেন—"আমি আশা করি, একপাট খেলিবার আপনার অবশ্যই সময় আছে।" তখন কে এমন পুরুষ আছে,—কে এমন বলবান ভীম-পুরুষ আছে, যে, সে নারী বাক্য লঙ্ঘন করিতে সমর্থ? কার ঘাড়ে দুটা মাথা, তখন সেই লাবণ্যময়ী ললনার সে খাতির এড়াইতে পারে? খেলা হইবে যখন স্থির হইল, তখন আর একটা বিশেষ সমস্যা উঠিল, কে কাহার সহযোগী হইবেন? দুটী স্ত্রীলোক এবং দুটী পুরুষ হইলে বড় গোল-যোগ নাই, সহজেই দুইটা যোট বাঁধিল। কিন্তু যদি পুরুষ তিনটী হয় এবং স্ত্রীলোক একটী হয়, তবেই বিষম বিভ্রাট—তর্ক উঠে, রমণী কাহার সহযোগিনী হইবেন, শক্তি কোন্ ভাগ্যবান শবের সাহায্যে নিযুক্ত হইবেন? বলা বাহুল্য, পুরুষ তিনটার প্রত্যেকটারই ইচ্ছা, রমণী তাঁহার সহ-যোগিনী হউন। সে সময় রমণীও একটু বিপদে পড়েন। তিনি সহজেই চক্ষুলজ্জাবশত দুই জনের উপেক্ষা করিয়া এক জনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আপসে যদি এ মহা-বিবাদ না মিটিল, তবে তখন তাস কাটাইয়া কে

কাহার সহযোগী হইবে স্থির করা হইল। যে বজ্রদগ্ধ বৃক্ষে অঙ্কুর দেখা দিল,—যে ভাগ্যবান্ পুরুষের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল,—প্রকৃতি যে পুরুষের সহযোগিনী হইলেন, তাঁহার উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া অবশিষ্ট হতভাগ্য পুরুষদ্বয় দুচারিটা ঠাট্টা তামাসা করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক না হইলে যে এ খেলা হয় না, এমন নহে। তবে মনে কর সন্ধ্যার সময় একজন বন্ধু আসিলেন, বাটীর গৃহিণী বা কন্যারা সেই বন্ধুর সম্মান ও বিনোদনার্থ একহাত হুইষ্ট খেলিতে অনুরোধ করিলেন, এই রকম অনুরাধ উপরোধে খেলাটা প্রায়ই হইয়া থাকে। মেয়েদের সহিত হুইষ্ট খেলিতে হইলে, যে সব বাজে কাজ—খাটনীর কাজ, তোমাকে করিতে হইবে। তোমার সহযোগিনী যে কিছু করিবেন না, বা করিতে চাহেন না, এমন নহে, তবে তুমি যদি তাঁহার হইয়া সেই কার্য্যগুলি করিয়া দাও, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমায় ধন্যবাদ দিবেন, তুমি তাঁহার জাতি মর্য্যাদা রক্ষা করিলে বলিয়া তোমার উপর প্রসন্না হইবেন।

মনে কর, তোমাদের পিঠ হইয়াছে, পিঠ অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে; যদি তুমি দেখ তোমার সহযোগিনী ললনা সেই পিঠ তুলিয়া যাইতেছেন, তখন তুমি কি করিবে? পুরুষ-প্রাণে নারী-কষ্ট কখনও সহ্য হইতে পারে না,—অতএব তাঁহাকে সে কষ্ট না দিয়া নিজে সকল সহ্য করিবে। ফরাস্ বিছানার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া খেলা হইতেছে না,—টেবিলের উপর চেয়ারে বসিয়া খেলা, হঠাৎ একখানা তাস ভূমিতে পড়িয়া গেল,—দেখো খুব্ খবরদার, যেন পুরুষোচিত নারী-বিনোদন ভুলিয়া সহযোগিনীকে তাস তুলিবার কষ্ট দিও না। উপসংহারে কেবল এই কথা বলিব, রমণী খেলায় হারিলেও, তাঁহার জিত।

বিলাতী সমাজ।

২৯শে মার্চ।

ভাই! বিলাতী সমাজ বাহ্যদৃশ্যে যতটা চাক-চিক্যময় বোধ হয়, ভিতরে কিন্তু ততটা নয়। ঐ দেখ, রমণীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে—যেন আঁধার গৃহে শারদীয় পূর্ণিমার চন্দ্রকর হাসিতেছে; পুরুষ-ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া আসিয়া বলিল—"আমি তোমারই,—তোমা বই কিছু জানি না, কিছু ভাবি না, আমি তোমা-ময় জীবন।" অর্দ্ধ-শিক্ষিতা অবোধ রমণী সংসার বুঝে নাই, সমাজ বুঝে নাই, পুরুষ-চরিত্র বুঝে নাই,—ভাবিল ইনিই বুঝি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, ইনিই বুঝি আমার হৃদয়ের কৌস্তভ মণি, ইনিই বুঝি আমার অন্তরের রত্ন সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র। তখন রমণীর প্রেমপূর্ণ ক্ষুদ্র হৃদয় স্বর্গীয়-ভাবে উথলিয়া উঠিল, পৃথিবীকে নন্দন কানন দেখিল, অভিলষিত পরম পুরুষকে দেবতা বলিয়া বুঝিল। হায়! সেই অবলার অবোধ প্রাণ এক-

বারও ভাবিল না,---ইহা দুষ্ট নিশাচর মারীচের মায়া-জাল; হর্ষোৎফুল্ল লোচন, বিকশিত গণ্ডস্থল, হাসি হাসি মুখে সেই সপ্তদশ বর্ষীয়া বালা নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে মায়াবীর মায়া-ফাঁদে পা বাড়াইল---আর অমনি মরিল। ভাই! এ দেশে এ সকল দৃশ্যের বড় একটা অভাব নাই। এদেশে মুখে মধু, হৃদয়ে বিষ; মুখে প্রেম, অন্তরে ঘৃণা। এ দেশে যেন এক রকম প্রেমের দোকানদারি চলিয়াছে। পুরুষের দোষে রমণীকুলও কুশিক্ষা পাইয়াছে; কুশিক্ষায় কুকর্ম্মস্রোত অবাধে চলিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালী-চক্ষে যেরূপ দেখিয়াছি, বাঙ্গালী-হৃদয়ে যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইরূপ লিখিলাম। তবে আমাদের চক্ষু দোষযুক্ত, হৃদয় বিষাক্ত হইতে পারে। বিলাতের যে সকল লোকই ঐরূপ দূষিত ভাবাপন্ন তাহা অবশ্যই বলি না।

অনেক কথা বলিবার আছে। এদেশে মধ্যবিৎ লোকের স্ত্রী কন্যা ভগিনী যে আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর রমণীগণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত, তাহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে। শিক্ষিত স্বামী যদি শিক্ষিতা স্ত্রী পায়, তবে উভয়ের মধ্যে শীঘ্র

প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা। সেইজন্য আমার জ্ঞান ছিল, বিলাতের ঐ শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ মধ্যে অধিক ভাব বা সহানুভূতি আছে। কিন্তু ক্রমে যত নিকটে যাইতেছি, যতই আঁধার হইতে আ-লোকে যাইতেছি,—ততই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, আমার বিবেচনা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। আমার জ্ঞান ছিল, বিলাতী-স্বামী হয়ত সমস্ত দিন কোন আ-পীসে লেখনী পেশন করিয়া কার্য্যান্তে সন্ধ্যার সময় শিক্ষিতা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া নানা বিষয়ক প্রসঙ্গে সহধর্ম্মিণীর সহানুভূতি পাইয়া দিবসের ক্লান্তি দূর করেন,—পারিবারিক সুখে মগ্ন হয়েন। আমার জ্ঞান ছিল, উভয়েই হয়ত একাসনে বসিয়া একযোগে একমনে দৈনিক সংবাদ-পত্র পড়িয়া থাকেন। দূর হইতে মনে মনে কতই কল্পনা করিয়াছিলাম, সাধের বাগান কেমন মল্লিকা মালতী যুঁই গোলাপে সাজাইয়াছিলাম,—এখন তাহা ভাবিলে হাসি পায়। ভাবিতাম বুঝি সন্ধ্যার পর গৃহস্থিত অগ্নিকুণ্ডের নিকট চৌকী টানিয়া লইয়া গিয়া পার্লেমেণ্টে কি হইতেছে, স্ত্রী পুরুষ তদ্সম্বন্ধে কথোপকথন করে; গ্লাডষ্টোন ও

রেনডোল্‌ফ্ চর্চ্চহিলের বাক্য-যুদ্ধ লইয়া হয়ত আধ ঘণ্টা কাটাইলেন;—পার্লমেণ্টের মেম্বর বিগার সাহেবের চুক্তি ভঙ্গের উপর হয়ত একবার কটাক্ষ হইল; কি উভয়েই হয়ত নভেল পড়িতেছেন,—স্বামী বুঝি থ্যাকারের দিকে, স্ত্রী বুঝি ডিকেন্সের দিকে হইলেন; ব্রাডলকে পার্লমেণ্টে স্থান দেওয়া উচিত কি না, তাহা লইয়া হয়ত শেষ সময়টা অতিবাহিত হইল। কল্পনাদেবীর এমনি প্রভাব যে "বিনা সূতে" আমি এই অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছিলাম। কিন্তু হরিবোল হরি! এ সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে।

কেবল নিম্ন শ্রেণীর লোকের কথা, বা ইতর লোকের কথা বলিতেছি না,—বিলাতের সাধারণ লোক সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করিয়া ক্লান্তি দূরের জন্য—অমোদের জন্য—স্ফূর্ত্তির জন্য পারিবারিক সুখ যথেষ্ট মনে করেন না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই পুরুষ-সিংহ অতি শশব্যস্ত হইয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়াছেন। কোথায় জান?—আড্ডা ঘরে (Public House)। আমাদের দেশের গুলির আড্ডায় ছোট লোকেরই গমনাগমন হয়,—যদিও

কখন দু একজন ভদ্রলোকও তথায় শুভ পদার্পণ করেন,—তবে সে অতি সংগোপনে। কিন্তু এখানকার আড্ডাঘর কেবল ইতর লোকের বিশ্রাম-স্থল নহে। তথায় গিয়া দুই এক ঘণ্টা না কাটাইলে সম্ভ্রান্ত চাকুরে পুরুষগণেরও যেন দিনটা ব্যর্থ অতিবাহিত হয়; আড্ডা ঘরে যাওয়া একটা বিশেষ রোগের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভামিনীকুল এই আড্ডা ঘরের বিরুদ্ধে আজ কাল বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন,—এরূপ না করিলে, তাঁহাদের স্বার্থ বজায় থাকে কই? রমণীমণ্ডলী উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—"আড্ডা ঘরে গিয়া এক আউন্স হুইস্কি (Whisky) পান, দুই এক গ্লাস বিয়ার বা দুচারিটা চুরাট না টানিলে কি আমোদ বা ক্লান্তি দূর হয় না?—ঘরে কি আমোদ নাই?" কিন্তু স্বার্থপর বলবান পুরুষ অবলার কথা শুনিবে কেন?

আড্ডা ঘরে প্রলোভন বিলক্ষণ আছে,—প্রায় সকল ঘরেই দুই একটী দিব্য দিব্য চুম্বক পাথর অবস্থিত করিতেছেন; পুরুষ-লোহা সে টান কতক্ষণ সহ্য করিবেন? গৃহের অধিকারীরা

পানভোজন বিক্রয়ার্থ স্ত্রীলোক নিযুক্ত করেন,—অধিকারী স্বয়ং হয়ত জাম্বুবানের মত চক্ষুদ্বয় ইষৎ মুদ্রিত করিয়া, ঘরের এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন,—যেন কোথাকার কে ? আর স্ত্রীলোকটী বেচাকেনা করিতেছে,—কথায় যেন হীরার ধার। এই স্ত্রীলোকদিগকে এখানে "বার-মেড" বলে। এই সকল বার-মেড নানাগুণে বিভূষিত হইবেন,—তন্মধ্যে দুইটী বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক,—১ম, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ২য়, বয়স কম। টাইম্‌স, ডেলি-নিউস, ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি বিলাতের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিবে, "বার-মেড হইবার জন্য এই দুইটী গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক।" এ সব গুণ ছাড়া গুণময়ীদের আরও নানা ঢঙে রঙে অলঙ্কৃত হওয়া চাহি। তাঁহাদের হাসিতে বিজুলি খেলিবে, গমনে রাজ-হংস লজ্জিত হইবে, কথায় সুধা বর্ষিবে, কটাক্ষে ত্রিভুবন মোহিত হইবে। যিনি ষড়গুণে বিভূষিত হইবেন, তাঁহারই আদর অধিক, পসার অধিক। যাত্রার দলের ছেলে ভাঙ্গিয়া লওয়ার মত এখানে উপযুক্তা "বার-মেড" ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া থাকে ;

কখন কখন এই অপূর্ব্ব জিনিসের জন্য, নিলাম ডাকাডাকি হইয়া থাকে। একে এ দেশের লোক অধিক পানাসক্ত—তাহার উপর আবার এই মহা-আকর্ষণ—ভাই! ইহাতে আর কি রক্ষা আছে?

শুনিয়াছি, কোন কোন ভদ্র সন্তান যদি দৈবাৎ এক রাত্রি আড্ডা ঘরে না যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সে রাত্রে নাকি ঘুম হয় না। বলা বাহুল্য, বার-মেডগণ ব্যবসায়ে সুচতুর, অজস্র-ধারে রসিকতা করিতে পারে। যে যেমন সকলের জন্যই দুটা মিষ্ট কথা আছে; কি ছোট, কি বড়, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ্য,—তিনি সকলেরই; তিনি সূর্য্যের ন্যায় সকল জীবের জন্য আড্ডা ঘরে উদিত হইয়া সমভাবে আলোক প্রদান করেন। যে ব্যক্তি এই বিলাতী-তিলোত্তমার মুখ-সুধাকর বিনিসৃত দু চারিটা রসিকতা না শুনিল, তাহার জীবনই বৃথা।

ভাই! কোথায় শিক্ষা, কোথায় স্ত্রী কন্যার উপর সহানুভূতি, কোথায় পারিবারিক সুখ! আড্ডা ঘরের চরণে সকলের আহুতি প্রদান হইল।

বিলাতে মৎস্য-মেলা।

১২ই মে রাজধানী লণ্ডন নগরে মহা সমারোহের সহিত মৎস্য-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। মেলা স্থানটী প্রায় ৭০ বিঘা বিস্তৃত। কোন অপরিহার্য্য কারণে ইংলণ্ডেশ্বরী এ মেলায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ প্রিন্সঅব্‌ওয়েল্‌সের হস্তে বোধনের ভার পতিত হয়। মহারাণী ব্যতীত রাজ পরিবারের আর সকলেরই এই উৎসবে অধিষ্ঠান হইয়াছিল। যুবরাজ ও তাঁহার মধ্যম সহোদর বরাবরই এ উৎসবে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহে, দেশের লোকের যত্নে এবং বিদেশীয় রাজার সাহায্যে, এই প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা। শনিবার উৎসবের প্রথম দিন; সে মহাদিনে মহামহিমদিগেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল রাজ পরিবার, প্রদর্শনীর পাণ্ডা মহাশয়গণ, নিমন্ত্রিত ভাগ্যবান ভদ্র মহোদয়গণ এবং দুই

গিনি টিকিটওয়ালা ধনকুবেরগণ ভিন্ন, আর কেহ সে মহাদিনে উৎসব-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজপরিবারের শুভাধিষ্ঠান হইবে, বড় বড় নিমন্ত্রিত মহাপুরুষদিগের অভ্যর্থনা হইবে, দুই-গিনিওয়ালাদিগের আগমন হইবে, মৎস্য-প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার প্রদর্শনী হইবে, এ জাঁক জমক দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবার জন্য প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের সম্মুখে—রাজমার্গের দুই পার্শ্বে, লোকে লোকারণ্য হইবে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। কীর্ত্তনের ভিতর ঢুকিতে পান না, কীর্ত্তনের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়ান, এমন লোক সকল দেশেই আছেন। মহোৎসবের সে মহাদিনে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল,—রাস্তা জল-কাদায় পরিপূর্ণ। জল-কর্দ্দম-বিহারী মীন কুলের মহোৎসব মনে করিয়াই যেন পর্জ্জন্যদেব মহাড়ম্বরে আমোদ করিতে আসিয়াছিলেন। রাস্তার এই অবস্থা, কিন্তু লোকারণ্যের কিছুমাত্র নিবিড়তা কমে নাই; কর্দ্দমাক্ত জল-স্রোতের সহিত লোকস্রোতের লড়াই লাগিয়াছিল। কিন্তু জলের স্রোত রহিয়া গেল, সন্ধ্যার

সহিত রাজ পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে লোকস্রোতের প্রত্যাগমন হইল।

রবিবার খৃষ্টরাজ্যের বিশ্রাম, প্রদর্শনীরও বিশ্রাম। সোমবার সাধারণের জন্য প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল। সোম, মঙ্গল দুই দিনের প্রবেশ-দক্ষিণা আট আনা। আপামর সাধারণের মাহেন্দ্র-যোগ। সোমবার উৎসবস্থলে ৬০ হাজার দর্শকের অধিষ্ঠান হইয়াছিল ;– দক্ষিণা আদায় করিয়া বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সে দিবস ৪ লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল।

প্রথম দিনের কৌতূহল কমিয়া গেল ; মঙ্গলবার ২৯ হাজার ৪৪৬ জন বই লোকের পদার্পণ হইল না। বুধবার টিকিটের দর চড়িল, প্রবেশ-দক্ষিণা একটী আধুলী হইতে তিন আধুলীতে উঠিল, কাজেই দর্শক-সংখ্যা আরও কমিয়া গেল। কিন্তু সে দিন আপামর সাধারণের দিন নহে, সে দিন গাড়ী ঘোড়ার সমাগমে প্রদর্শনীর পাণ্ডাদের এক প্রকার পোষাইয়া গেল। প্রদর্শনীতে পৃথিবীর প্রায় সকল মৎস্য-প্রধান দেশই যোগ দিয়াছেন। নিউ-সাউথ-ওয়েল্‌স, চিলি, আমাদের

ভারত, চীন, হলন্দ ও বেলজিয়ম, নরোয়ে, সুইডেন, ইউনাইটেডষ্টেট্স, নিউফাউণ্ডলণ্ড, দেন্মার্ক, স্পেন, কানাডা, রুষিয়া, গ্রীস, ইতালী, পর্ত্তুগাল, জামেকা, অষ্ট্রীয়া, বাহামা দ্বীপ, জর্ম্মণী, জাপান, হাওয়াই দ্বীপ, প্রণালী-প্রদেশ সকলেই এই আন্তর্জাতিক সাধু অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

ভাই! মৎস্য কুলের উন্নতির জন্য বিলাতের লোক যে কিরূপ যত্নশীল তাহা আর পত্রে কত লিখিব। আমরা ভারতবাসী, মৎস্য কুল ধ্বংস করিতে মজবুত,—কিন্তু কিসে যে মাছ সুস্বাদু হয়, সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, তাহা কখন ভাবি না।

বিলাতী বসন্তোৎসব।

সং সাজিয়া, ঢাক ঢোল বাজাইয়া, ছেলের পাল জড় করিয়া, রাস্তায় বাহির হওয়া যে কেবল আমাদের দেশের শ্রমজীবিদলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নহে। সভ্য ইংলণ্ডের শিক্ষিত শ্রম-

জীবিদিগের মধ্যেও এরূপ আমোদের অভাব নাই। মে মাসের ১লা ও ২রা এই উৎসবের দিন। কি লণ্ডনের সৌধমালা শোভিত রাজপথে, কি পল্লী-গ্রামের বৃক্ষরাজি বিরাজিত রাজপথে, সর্ব্বত্রেই শ্রমজীবি দলে এই উৎসব। পাঁচ সাত জন সাহেব একত্র হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিকট সাজে সজ্জিত হইয়া ঢাক ঢোল বাজাইতে বাজা-ইতে সব্বত্রেই সং সাজিয়া বাহির হয়। কেহ বা এক গালে চূণ এক গালে কালী, (বিলাতী সংদিগের চূণের অপেক্ষা কালীর ভাগ কিছু বেশী লাগে, ইহা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই) লেপিয়া, কেহ বা দুই গালে কালী মাখিয়া সঙামীর একশেষ হইল বলিয়া মনে করেন। দলের মধ্যে এক জন কেবল নানা জাতীয় পত্র দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করেন, এই জন্যই এই তামাসাকে ইংরাজীতে Jack in the green (অর্থাৎ হরিতপত্র পরিশোভিত জ্যাক) বলা হয়। সং সাজিয়া সকলেই ঢোল ঢাকের সঙ্গতের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির নানাপ্রকার নমুনা দেখাইতে দেখাইতে, রাস্তা দিয়া চলিয়া যান।

লণ্ডনের মত হুজুকে সহর আর কুত্রাপি নাই। লণ্ডনের পথে বৃষ্টি পড়িতে না পড়িতে যেমন রাস্তা কাদায় পূরিয়া যায়, তেমনি নূতনতর একটা কিছু বাহির হইতে না হইতে, মুহূর্ত্ত মধ্যে রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। লোক জড় করিবার এমন সহজ উপায় আর কোন সহরে আছে কি না বলিতে পারি না। দেখিলাম সং-ওয়ালাদের দল যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, তামাসাখোরের দলও ততই ঘন হইতে লাগিল। কলিকাতায় পূর্ব্বে চড়কের সময় কাঁসারীদের সঙেরা যেমন লোকের (জায়গা বুঝিয়া বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া) মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য, লম্ফ দেখাইয়া বাহাদুরি লইবার চেষ্টা করিত, এখানকার এই চড়কে সং-সাহেবেরা সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে প্রভেদের মধ্যে, এখানে বাহাদুরি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে, ইঙ্গিতে পাকে প্রকারে অর্থ ভিক্ষাও করা হয়। প্রকাশে স্পষ্টভাবে ভিক্ষা করা এখানে নিষিদ্ধ, তাহা তোমার পাঠকগণের অবশ্যই বিদিত আছে, কিন্তু এরূপ ইঙ্গিতে ভিক্ষা করা এখানে আইনের নিকট নিষিদ্ধ নহে। যে লোকের

া টীর কাছে বিলাতী সঙেরা দাঁড়ান, সে লোকের কাছে কিছু বাহির না করিয়া ইহাঁরা সহজে যান না, ভিক্ষুকের জোর নাই, তবুও ক্রমাগত লম্ফঝম্ফ ও অঙ্গ ভঙ্গিতে ভুলাইয়া হউক আর ভয়েই হউক বাটীর লোকেরা দুই এক শিলিং না দিয়া আর কতক্ষণ থাকিতে পারেন? "জ্যাক ইন দি গ্রীন" নামক এই বিলাতী তামাসার উৎপত্তি প্রকরণ আমি ঠিক অবগত নহি। কিন্তু মে মাসের প্রথমে বিলাতী বসন্তের প্রারম্ভে, পত্রকুসুমহারী দুরন্ত শীতকে বিসর্জ্জন দেওয়া এবং পত্র পল্লব পরিশোভিত বসন্তকে অভ্যর্থনা করাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য; এই জন্যই আমি উপরে ইহার "বিলাতী বসন্তোৎসব" নাম দিয়াছি। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, সে জন্য আমি চিন্তিত নহি; ভাল মন্দ বিচারের প্রয়োজন দেখি না, কেবল তোমার পাঠক পাঠিকাদিগকে এই মাত্র দেখাইবার ইচ্ছা যে, এইরূপে সঙ সাজিয়া বাহির হওয়া সভ্যতম দেশেও আছে।

১ম ভাগ সমাপ্ত।